ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ।। ৫ বৈশাখ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১৯ এপ্রিল, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

মুসলিম সংরক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা পশ্চাৎপদ কেন?

এষা দে।। পশ্চিমের অনুসরণে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা, যে গণতন্ত্রের ভিত্তি আইনের দৃষ্টিতে জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার। কিন্তু দীর্ঘ শত শত বছরের যে রাজনৈতিক সামাজিক আর্থিক রূপান্তরের ফলে পশ্চিমে গণতন্ত্রের বিকাশ আমাদের দেশে সে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এক

বিশাল শ্রেণীর মানুষজনের শোচনীয় অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের দরুণ নাগরিক হিসাবে অধিকার অর্জন ও কর্তব্য পালন দুই-ই রয়ে গেছে অধরা স্বপ্ন। এঁদের উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার নিরিখে শিক্ষায় ও কর্মে অগ্রাধিকার শুধু মানবিক দাবি নয়। সুস্থ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গঠনে একমাত্র পথ। বহুধর্মী বহুবৈচিত্র্য বিশিষ্ট বিরাট উপমহাদেশে দারিদ্র্যের মাপকাঠি প্রয়োগেই সর্বপ্রকার জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়া মানুষ ক্ষমতায়িত হতে পারেন।

দুঃখের বিষয় আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসনের সুকৌশলী ভেদনীতিরই উত্তরাধিকারী। ফলে দীর্ঘ ছ'টি দশকে জাতি জনজাতি ভিত্তিক সংরক্ষণ নীতিতে ক্ষমতার নব্য সমীকরণ হয়েছে। মুষ্টিমেয় মায়াবতী লালুযাদব শিবু সোরেনরা হয়েছেন রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। স্বভাবতই মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বঞ্চনার ক্ষোভ। এখন ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের আয়োজন চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। কারণ এ রাজ্যেই নাকি মুসলমানরা সবচেয়ে পশ্চাৎপদ।

ইতিমধ্যে বহু তস্য ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় সংরক্ষণের ন্যায্যতা বিতর্কিত। তার চেয়ে বড় অনেক পণ্ডিত দেখিয়েছেন সংরক্ষণ হলেও মুসলমানদের অতি ক্ষুদ্র অংশই উপকৃত হবেন। কারণ তাঁদের মধ্যে অ-শিক্ষা ও অজ্ঞতা এত ব্যাপক যে কোনও সরকারি চাকরিরই ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন তাঁদের পক্ষে সহজ নয়। বাংলার মুসলমানদের বেশির ভাগ গ্রামবাসী। সম্প্রতি প্রকাশিত

(এরপর ৪ পাতায়)

খৃস্টান-ইসলামি মালিকানাধীন সংবাদ মাধ্যমের নগ্ন হিন্দু বিরোধিতা

গুঢ়পুরুষ।। ভারতের ইংরাজি সংবাদমাধ্যম একশো শতাংশ হিন্দু বিরোধী। এর একটা কারণ হয়তো হিন্দু সমাজ প্রতিবাদ বা প্রত্যাঘাত করে না। কিন্তু এটি একমাত্র সত্য নয়। আসলে ভারতের ইংরাজি সংবাদমাধ্যমের অধিকাংশই এখন কট্টর হিন্দু বিরোধী সংস্থার মালিকানায় চলছে। কেমন সেই মালিকানা একবার পড়ুন—

এন ডি টিভি ঃ প্রণয় রায় এই সংস্থার প্রধান ভারতীয় পরিচালক (সি ই ও) মাত্র। টিভি সংবাদচ্যানেলটির আসল মালিকানা স্পেনের 'গসপেলস্ অব চ্যারিটি' সংস্থার। এই সংস্থাটি সারা বিশ্বে ধর্মান্তরকরণকে তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করে। ভারতে তারা 'হেট হিন্দু' প্রচারের জন্য এন ডি টি ভি চ্যানেলের মাধ্যমে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে। মনে রাখতে হবে প্রণয় রায় এবং সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত পারিবারিক সম্পর্কে ভায়রাভাই। এন ডি টি ভি-র পাকিস্তান প্রেমের জন্য পারভেজ মুশারফ একমাত্র এই টি ভি চ্যানেলটিকেই পাকিস্তানে সম্প্রচারের অধিকার দেন।

ইন্ডিয়া টুডে ঃ গোড়ায় এই সর্বভারতীয় ইংরাজি সাপ্তাহিকটি বিজেপি-র জাতীয়তাবাদী নীতির সমর্থক ছিল। সম্প্রতি এন ডি টি ভি কর্তৃপক্ষ এই সাপ্তাহিকটির মালিকানা কিনেছে। এরপর থেকেই সাপ্তাহিকটির চরিত্র বদল হয়েছে। এখন এই ইংরাজি পত্রিকাটি কট্টর হিন্দু বিরোধী।

টাইমস্ গ্রুপ ঃ কাগজেপত্রে মালিক বেনেট কোলম্যান। তবে এখন আমেরিকার অতি বিত্তবান সংস্থা 'সাউদার্ন ব্যাপটিস্ট চার্চ'। এই সংস্থা খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরকরণের জন্য প্রতি বছর ৮০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে। সারাবিশ্বে তাদের অসংখ্য টিভি চ্যানেল আছে। এরই একটি সি এন এন আই বি এন। ভারতে এর প্রধান পরিচালক হলেন রাজদীপ সারদেশাই ও তাঁর বাঙালি স্ত্রী সাগরিকা ঘোষ।

স্টার নিউজ ঃ এটি নেপথ্য থেকে পরিচালনা করে অস্ট্রেলিয়ার এক শিল্পপতি। কাগজ-পত্রে অবশ্য নাম আছে মেলবোর্নের সেন্ট পিটার্স পন্টিফিসিয়াল চার্চের। এই চার্চ ধর্মান্তরকরণে প্রবল উৎসাহী। এই টিভি চ্যানেলটি সাম্প্রতিককালে মুরারী বাপুর আশ্রমকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে। বাপুর অপরাধ—তিনি ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের হিন্দু ধর্মের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনেন।

দ্য হিন্দু ঃ চেন্নাই থেকে প্রকাশিত তামিলনাড়ুর প্রথম শ্রেণীর এই ইংরাজি দৈনিকটির মালিকানার হাত বদল হয়েছে। এখন এই দৈনিকটির প্রধান লগ্নিকারক হচ্ছে সুইজারল্যাণ্ডের খৃষ্টান ধর্মীয় সংস্থা 'জোসুয়া সোসাইটি'। একবার ভেবে দেখুন 'দ্য হিন্দু' নামের আড়ালে কেমনভাবে হিন্দু বিরোধীরা লুকিয়ে আছে।

এশিয়ান এজ ঃ এই ইংরাজি দৈনিকটির সম্পাদক এম জে আকবর। অনেকে তাঁকেই এই দৈনিকটির মালিক মনে করেন। কিন্তু এই দৈনিকটি চলে সৌদি আরবের একটি শিল্পপতির টাকায়। সৌদির এই শিল্পপতির ঘোষিত নীতি, ইসলাম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এই মতবাদ প্রচার করা। ভারতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্যই তিনি বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। তবে এই দৈনিকটির তেমন প্রচার নেই। ইংরাজী সংবাদমাধ্যমের হিন্দু বিরোধিতার কারণটি বুঝতে অসুবিধা নেই। এদের মালিকরা বিদেশী। কিন্তু ভারতীয় আইনে সংবাদমাধ্যমের মালিকানা সরাসরি বিদেশী লগ্নিকারীরা পেতে পারে না। তাই সামনে কয়েকজন ভারতীয়কে শিখণ্ডী খাড়া করে রাখতেই হয়। প্রণয় রায়, রাজদীপ সরদেশাই অথবা এম জে আকবর, এন রামেরা এমনই শিখণ্ডী।

শিখণ্ডী ভারতীয় সাংবাদিক

প্রণয় রায়, এন ডি টি ভি

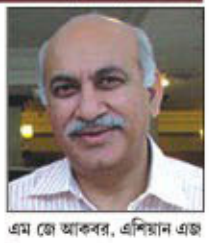
এম জে আকবর, এশিয়ান এজ

এন রাম, দ্য হিন্দু

রাজদীপ সারদেশাই, টাইমস গ্রুপ

মহাকাশে চীনা বর্জ্যের সংঘাত এড়াতে ভারতের নজরদারি

চলছে হ্যাকিং, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত খবর চীনের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। চীনা গোয়েন্দা বিভাগ হ্যাক করে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত অতি গোপনীয় খবরাখবর জেনে নিচ্ছে। এযাবৎ ভারত সরকারের অন্ততপক্ষে ৭০০ অতি গুরুত্বপূর্ণ, গোপন এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা নথিপত্র চীন হ্যাক করে জেনে ফেলেছে। এসবই জাতীয় প্রতিরক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এইসব নথিতে ছিল ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের অসম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা এবং মাওবাদীদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য। 'হ্যাক' শব্দটা আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির জগতে বহুল ব্যবহৃত। 'হ্যাক' করে অন্যের গোপনীয় বা ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে ঢুকে সবকিছু জানা যায়, এমনকী ওলটপালট করে দেওয়া যায়। চীন এই কাজটাই করছে বলে দাবী করেছেন টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কানাডিয়ান এবং আমেরিকান গবেষক। তারা চীনের এই কূট প্রয়াসকে 'স্যাডো নেটওয়ার্ক' বলে অভিহিত করেছেন। গত প্রায় আটমাস ধরে চীন এই অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ওই চীনা বিশেষজ্ঞরা দলাই লামার ব্যক্তিগত ই-মেলও খুলে পড়ছেন বলে জানা গেছে।

চীনা গোয়েন্দাদের 'স্যাডো সাইবার নেটওয়ার্ক' ভারত এবং দলাই লামা ছাড়াও আমেরিকার পাক দূতাবাসের কাজকর্ম, ন্যাটো (NATO) বাহিনীর আফগানিস্তানের গতিবিধির ওপরও নজরদারি চালিয়েছে।

আমেরিকার সংবাদপত্র 'নিউইয়র্ক টাইমস্' এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছে। পত্রিকাটির মতে, চীনা গোয়েন্দারা ভারতের সামরিক গোয়েন্দা শাখার জনৈক ডাইরেক্টরের ব্যক্তিগত কম্পিউটার হ্যাক করে তথ্য সংগ্রহ করছে। টরেন্টোর গবেষকদের কথায় কাবুল, মস্কো, দুবাই, নাইজিরিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর ভারতীয় দূতাবাসের গোপনীয় খবরা-খবরও হ্যাক করে জেনে নেওয়া হয়েছে।

তবে ওই গবেষকরা তাদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলে জানিয়েছেন। তাদের বক্তব্য ভারত সরকারের কম্পিউটার অথবা বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের ব্যক্তিগত কম্পিউটার, ব্লগ থেকে তথ্য হাতানো হয়েছে। গবেষকদের কথায়

(এরপর ৪ পাতায়)

নিজস্ব প্রতিনিধি।। চীনের পরিত্যক্ত মহাকাশ-বর্জ্য বিভিন্ন দেশের সক্রিয় উপগ্রহের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক। চীনের ভূ-নিয়ন্ত্রিত ওই সকল বর্জ্য শুধু ভারতের পক্ষেই নয়, বিশ্বের তাবৎ দেশের পক্ষেও বেশ ভীতিজনক, বিশেষত যাদের উপগ্রহ মহাকাশে সচল রয়েছে। সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এরকমই অভিযোগ করেছেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ইসরো) চেয়ারম্যান কে রাধাকৃষ্ণণ। তিনি বলেছেন, "২০০৭-এর জানুয়ারিতে চীনের ওই মহাকাশ বর্জ্য চীনেরই একটি উপগ্রহকে নষ্ট করে ফেলেছে। চীনের মহাকাশে এরকম বর্জ্য হাজারে হাজারে ছড়িয়ে রয়েছে। যে কোনও সময় অন্যান্য দেশের উপগ্রহের সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা।"

এই প্রসঙ্গে ভারতের পক্ষে বিপদের সম্ভাবনার বিষয়ে রাধাকৃষ্ণণকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, মহাকাশ নিয়ে গবেষণারত দেশগুলির একটি সংস্থা

কে রাধাকৃষ্ণণ

'ডেবরিশ কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ, গঠিত হয়েছে। এই গোষ্ঠীটি মহাকাশে বর্জ্য বিষয়ে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করবে। রাধাকৃষ্ণণ আরও বলেন, যে কোনও সম্ভাব্য সঙ্ঘর্ষ এড়াতে চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে। আমাদের উপগ্রহগুলোকে সঙ্ঘর্ষ এড়ানোর

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

মালদায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

বিধ্বস্তদের পাশে স্বয়ংসেবকরা

তরুণ কুমার পণ্ডিত ঃ মালদা।। গত ৫ এপ্রিল মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার বিননগর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনগর (কানাইপুর) গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১০০টির উপরে বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেলে বাসিন্দারা গৃহহীন তো বটেই,সর্বস্ব খুইয়ে বসেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা সেখানে ছুটে যান ও উদ্ধার কাজে হাত লাগান। ৭ এপ্রিল মালদা শহর থেকে সঙ্ঘের একটি দল বিননগর গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষদের সাথে কথা বলে জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে হাজির হন। ওই দিন সঙ্ঘের সেবা বিভাগের পক্ষ থেকে ৭০টি পরিবারকে দুটি করে স্টিলের থালা, গেলাস, প্লাস্টিকের মগ ও বালতি এবং একটি করে গামছা দেওয়া হয়। বিধ্বংসী এই অগ্নিকাণ্ডে গ্রামের বাড়িতে থাকা গম, ধান, আলু (মজুত করা) সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে জানা যায়, কানাইপুর গ্রামের ছেদু মণ্ডলের বাড়িতে রান্না করার উনান থেকে আগুন লাগে। যেহেতু এলাকার প্রতিটি বাড়িই মাটি, খড়, চাটাই ও টিনের ছিল তাই বাতাসে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে সমস্ত পাড়াটি শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আগুন লাগার খবর পেয়ে মালদা ও এন টি পি সি ফরাক্কা থেকে বেশ কয়েকটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোলেও জলের অভাবে আগুন তাড়াতাড়ি নেভাতে পারেনি। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা আসেনিক মুক্ত জলের পাইপ ফাটিয়ে সেই জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করেছে। বেশ কয়েকটি গবাদি পশু আগুনে পুড়ে গেছে। শ্যামল ঘোষ সহ কয়েকজনের বাড়িতে ২৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা জমা ছিল। সেগুলি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। রাজনগরে সঙ্ঘের শাখা থাকার জন্য কয়েকজন স্বয়ংসেবকদের বাড়ি পুড়লেও বাকিরা পরিমল ঘোষ ও সুশান্ত সরকারের নেতৃত্বে রান্না করা খাবার ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করছে। গ্রামে গিয়ে দেখা গেল পরিমল ঘোষের বাড়ির সামনে পলিথিন টাঙিয়ে দুটি বড় কড়াইতে রান্নার কাজ চলছে। মন্দিরে গিয়ে স্থানীয় মানুষ চাল, ডাল ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে আসছে, আসে পাশের মানুষরা সবাই অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে। সরকারী ভাবে কিছু বস্ত্র ও খাবারের ব্যবস্থা হলেও পরিমল ঘোষ জানালেন, সরকারি সাহায্য ছাড়াই তারা আগামী একমাস খাওয়ানোর ব্যবস্থা ১০০টি পরিবারকে করতে পারবে। সঙ্ঘের কালিয়াচক শাখা থেকে দুই এক দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে মশারী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা।

এই সময়

জনগণনায় ওবিসি

পিছিয়ে পড়া শ্রেণী (আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস)-র জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠে গেল আচিরেই। গত ১২ এপ্রিল দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে একটি পি আই এল দাখিল করে বলা হয়েছে, ২০১১-এর জনগণনায় (সেনসাস-২০১১) ওবিসিদের সংখ্যাটা সুনির্দিষ্টভাবে গণনা করা প্রয়োজন। পি আই এল দাখিলকারী কিশোর গোবিন্দ কানহারে এবং তাঁর আইনজীবী ডি কে গর্গ বলছেন, মন্ডল কমিশন বলেছিল জনসংখ্যার ৫২ শতাংশই ওবিসি। আবার ন্যাশানাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন (এন এস এস ও) তাদের ২০০৪-০৫ সালের ৬১ তম গণনায় মন্তব্য করেছিল দেশের ৪১ শতাংশ মানুষ ওবিসি অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এনিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার প্রয়োজন রয়েছে।

রাজ্যপালের উপদেশ

জীবনদায়ী ওষুধ এবং পোলট্রি জাত পশুর উৎপাদন হার আমাদের দেশে যথেষ্ট কম। এমনই অভিমত এ রাজ্যের রাজ্যপাল এম কে নারায়ণনের। প্রশাসকের চেনা ছকের বাইরে বেরিয়ে গত ১২ তারিখে প্রকৃত অর্থেই ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব্ অ্যানিমাল অ্যান্ড ফিসারি সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আচার্য' হিসেবে আবির্ভূত হন রাজ্যপাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি তাঁর উপদেশ, এরাজ্যের সম্পদ সমুদ্র-উপকূলে আরও বেশি বিনিয়োগ এনে 'ফিসারি' (মৎস্যচাষ) ও 'অ্যাকোয়া-কালচার' (জল-সম্পদ চাষ)-কে আরও সমৃদ্ধ করে তুলুক সরকার। এতে সরকারি কোষাগারও ভরবে।

রুষ্ট সরকার

দান্তেওয়াড়ার ঘটনা নিয়ে সেনাপ্রধান ভি কে সিং-এর মন্তব্যে বেজায় চটেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভি কে সিং বলেছেন, দান্তেওয়াড়ায় সাম্প্রতিক নকশাল হামলায় যে জওয়ানরা মারা যান তাঁরা পুরোপুরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন না। স্বভাবতই তিনি এই ঘটনার জন্য প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকেই আঙুল তুলেছিলেন। বিশেষ করে ওই সি আর পি এফ জওয়ানদের যে সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, এই ধরনের তথ্যকেও পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন তিনি। যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ভি কে সিং-এর মধ্যে 'পলায়নপর মনোবৃত্তি'র একটা সন্ধান পেয়েছে।

রেল যোগাযোগে ভিয়েতনাম

উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রেলযোগে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হলো কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় বিদেশ-প্রতিমন্ত্রী শশী থারুর জানিয়েছেন, "অসমের সঙ্গে ভিয়েতনামের হানোই-এর রেলযোগে সম্পর্ক স্থাপিত হবে মায়ানমারের মধ্যে দিয়ে।" কেন্দ্রীয় সরকারের একাংশের দাবী এর ফলে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতির একটা অবকাশ থাকবে। কিন্তু কূটনীতিকরা বলছেন—মাওবাদী সমস্যা যখন দেশের মধ্যেই চাগাড় দিয়ে উঠেছে, চীন যেখানে ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে সেখানে এই অবিমৃষ্যকারী কূটনৈতিক পদক্ষেপ না নিলেও চলত।

তোমার দেখা নাই

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সঙ্গে সম্যক পরিচিত হলো ১৪১৬ বঙ্গাব্দের বর্ষশেষের বাঙালী। অবিশ্বাস্য গরমে হাঁস-ফাঁস করতে করতে বাঙালী কালবৈশাখীর দেখা পেতে আকুল হয়ে উঠল। কিন্তু চৈত্রের চিতা ভস্ম উড়িয়ে পৃথিবীর জ্বালা জুড়তে 'তিনি' এলেন না। ১৪১৭ বঙ্গাব্দ কোনও কালবৈশাখীর সন্ধান দিতে পারে কিনা তা নিয়ে অধীর চিত্তে ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে থাকবে বঙ্গজন। আর মাঝে মাঝে গাইবে—'তোমার দেখা নাই রে। তোমার দেখা নাই।'

প্রকৃতিপ্রেমী বামফ্রন্ট

বামফ্রন্টের প্রকৃতি প্রেম দেখলে স্বয়ং উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেবও অজ্ঞান হয়ে যেতেন। বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলবে—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব, বিদ্যুৎ মন্ত্রী নিরুপমের এহেন স্পষ্ট রায়ের পর বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির এসি বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন। বামপন্থী এন জি ও-গুলো প্রচার করছে, এসি বন্ধ হলে নাকি প্রকৃতি বাঁচবে। সেদিক দিয়ে যা হচ্ছে ভালই হচ্ছে। এহেন প্রকৃতিপ্রেমী সরকার আর রাইটার্সে বসে কি করবে? সুন্দরবনে যাক! জনৈক পরিবেশবিদ আঁতকে উঠে বলছেন, না না। তেত্রিশ বছরে রাজ্যের ইকোনমিটা গেছে। ইকোলজির আর বারোটা বাজাবেন না।

শুভাপ্রসন্নের চ্যানেল

সি পি এম বনাম মমতা। দূরদর্শনের পর্দায় বহুলার এঁদের দ্বৈরথ প্রতীয়মান হয়েছে। এখন তা দৃশ্যমান হচ্ছে দলীয় মুখপত্রে পরিণত হওয়া বেশ কিছু বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে। যে তালিকায় নবতম সংযোজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত বিশ্বস্ত বলে পরিচিত শিল্পী শুভাপ্রসন্নের মালিকানাধীন একটি চ্যানেল। মমতার একান্ত উদ্যোগে কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচারসচিব মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে চ্যানেলটিকে। ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সিপিএমের উদ্যোগে যেভাবে বাজারে এসেছিল চব্বিশ ঘণ্টা বৈদ্যুতিন মাধ্যম, শুভাপ্রসন্নটাকে তারই '২০১১'-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে ধরছেন অনেকে।

প্রভিডেন্টে সুদের হার

এখনই সুদের হার বাড়ছে না প্রভিডেন্ট ফান্ডের। সম্প্রতি ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার ৮.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯.৫ বা ১০ শতাংশ করার দাবী তুলেছিল। কিন্তু প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষ সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে আপাতত স্থগিত রেখেছে। প্রসঙ্গত, প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত শ্রমিক-ইউনিয়নগুলোর সেন্ট্রাল বোর্ড অব ট্রাস্টি বহুদিন ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব, শ্রমিক-কর্মচারীদের জমানো অর্থের ১৫ শতাংশ শেয়ার-মার্কেটে বিনিয়োগ, নিয়ে টালবাহানা করছিল। এটা সরকারের পাল্টা চাল কিনা কে জানে!

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বেহাল বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ও বামফ্রন্ট সরকার

পশ্চিমবঙ্গে তাপ প্রবাহ যত বাড়িতেছে, তাহার সহিত পাল্লা দিয়া লোডশেডিং বা বিদ্যুৎ ঘাটতিও বাড়িয়া চলিতেছে। গ্রামবাংলার কথা দূরে থাকুক, খোদ এই রাজধানী শহর কলকাতাতেই নিয়ম করিয়া রোজ লোডশেডিং হইতেছে। ঘর গৃহস্থালী তো বটেই, কলকারখানা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজার-দোকানপাঠ, রাস্তাঘাট, এমনকী রেলওয়ে স্টেশন বা হাসপাতালের মতো জরুরী পরিষেবাও লোডশেডিং-এর গ্রাস হইতে নিস্তার পাইতেছে না। গত তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন সিপিএম নেতৃত্বাধীন শাসক জোটের ইহাই হইল স্বঘোষিত উন্নততর বামফ্রন্টের কর্মের নমুনা। সম্প্রতি বিদ্যুতের দাবীতে রাজ্যের বিবিধ স্থানে যেমন সল্ট লেকে পি এন বি মোড়ে বিদ্যুতের অফিসে ঘেরাও, দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে পথ অবরোধ, হাওড়ার জয়পুরে গোরুর গলায় লণ্ঠন বাঁধিয়া বিক্ষোভ, বীরভূমের সিউড়ীতে বিদ্যুৎ অফিসে ভাঙচুর চালানো হইয়াছে।

বিদ্যুৎ সংকটের এই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে নতুন নহে। জ্যোতি বসুর জমানাতেও রাজ্যের মানুষ দুঃসহ গ্রীষ্মে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াছে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা হইতে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কিছুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। বরং রাজ্যবাসীকে ভাঁওতা দিয়া ভোট-ব্যাঙ্ক পলিটিক্সের কলাকৌশলে ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিয়াছে, সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিয়াছে, নেতা হইতে ক্যাডার—সবাই আপন আপন পকেট স্ফীত করিয়াছে। বিদ্যুৎ সংকটজনিত অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় নাই—যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। এই রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দিল্লী হইতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আসিয়াছে। সেই টাকা সিপিএমের লিডার-ক্যাডাররা লুঠেপুটে খাইয়াছে। তাই বিদ্যুতের এই বেহাল অবস্থা।

৬৩ বছর দেশ স্বাধীন হইয়াছে। যুক্তফ্রন্ট এবং বামফ্রন্ট মিলাইয়া ৩৭ বছর রাজত্ব করিয়াছে। একটিও নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করিতে পারে নাই। বক্রেশ্বর ধুঁকিতেছে। নবনির্মিত সাগরদিঘী বিদ্যুৎ প্রকল্প দুর্নীতির জন্য অকেজো। চীনা কোম্পানী ডং ফ্যং-এর সাগরদিঘীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির নেপথ্যে সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীরা বহু কোটি টাকা ঘুষ খাইয়াছেন—রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল এমন অভিযোগ করিয়াছে। বিদ্যুৎ পর্ষদের গ্যাস টারবাইন ক্রয় করা এবং সেই প্রযুক্তি বাতিল করা, ডি পি এলের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বসিয়ে মোটা টাকা কামাই, দেশীয় সংস্থা ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালসকে এড়াইয়া গ্লোবাল টেন্ডার ছাড়াই চীনা সংস্থা ডং ফ্যং-কে আমন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলি তদন্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

বিদ্যুৎ-সঙ্কটের কারণ হিসাবে বছরের পর বছর বামফ্রন্ট সরকার কখনও নিম্নমানের কয়লা, কখনও বা রেকের অভাবের কথা রাজ্যবাসীকে শুনাইয়াছে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ পরিস্থিতি লইয়া আলোচনার জন্য ডাকা এক বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের দুই সংস্থার কর্তারা যেভাবে মুখের উপর জবাব দিয়াছেন, তাহাতেই নিজের দপ্তরের ব্যর্থতা ধরা পড়িয়া যাওয়ার আশংকাতেই বিদ্যুৎ মন্ত্রী নিরুপম সেন সুর বদলাইবার কৌশল লইয়াছেন। বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবিলার এই প্রথম চাপান-উতোর ছাড়িয়া রাজ্য সরকার কোল ইন্ডিয়া ও রেল-কর্তৃপক্ষকে লইয়া একটি নজরদারি দল গঠন করিয়াছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার যোগান প্রয়োজন মাফিক কিনা, কয়লার মান উপযুক্ত কিনা, কয়লার জন্য যথেষ্ট রেক পাওয়া যাচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়মিত নিরীক্ষণ করিবে এই পরিদর্শক দল।

একদিকে দুর্নীতি তো অন্যদিকে অপচয়। রাজ্যজোড়া বিদ্যুতের হাহাকারের মধ্যেও কলকাতার অনেক রাস্তায় যে দিনের বেলায় আলো জ্বলে বিদ্যুৎ অপচয় হয়, কার্যত তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (আলো) সুশীল শর্মা। বিদ্যাসাগর সেতুর সব কয়েটি বিশাল বিশাল হ্যালোজেন সকালেও জ্বলিয়া থাকে। নিবেদিতা সেতুতেও একই ছবি। পশ্চিমবঙ্গে সব মিলাইয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ৬৩০০ মেগাওয়াট। ইহার মধ্যে প্রতিদিন শুধু অপচয়ই হইতেছে কমপক্ষে এক হাজার মেগাওয়াট। অপচয়ের এই বহরটা না কমাইতে পারিলে রাজ্যের বিদ্যুৎ চিত্র উজ্জ্বল হওয়ার বিশেষ আশা নাই। আসলে জ্যোতি বাবু এবং বুদ্ধ বাবুর দূরদৃষ্টি কোনও কালেই ছিল না। সিপিএম নেতারা শুধু আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা ছাড়া আর কিছুই করেন নাই।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

অজানাকে জানা এবং যে পথে কেউ কোনওদিন চলেনি সেই পথে চলার আকর্ষণের চেয়ে অন্য কোনও আকর্ষণ আমার জীবনে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। অনিশ্চিত এই জীবনে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে—আবার এখানে আনন্দও আছে; এখানে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কালখণ্ড যেমন আছে তেমনি আবার ঊষাকালের আলোর সম্ভাবনাও আছে। এই দুর্গম পথে চলবার জন্যই আমি আমার দেশবাসীকে আহ্বান জানাই।

—সুভাষচন্দ্র বসু।। ভারত পথিক

কেন্দ্র-রাজ্য বাজেট

মুসলিম তোষণের ফ্রি-স্টাইল প্রতিযোগিতা

এন সি দে

যে কংগ্রেস, মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোসের মধ্য দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করেছে; যে কমিউনিস্টরা মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠীকে একটি পৃথক জাতি হিসাবে আলাদা রাষ্ট্র গঠনে বরাবর মদত দিয়ে এসেছে; সেই কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে পুনরায় মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতায় খোলাখুলি নেমে পড়েছে। মুসলিম তোষণের মধ্য দিয়ে হিন্দুস্থানের ক্ষমতা করায়ত্ত করেই কংগ্রেস প্রথমেই কুঠারাঘাত করে হিন্দুস্থানের সনাতন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জাতিসত্তাকে এবং দুর্নীতি, অপপ্রচার ও অপশাসনের মাধ্যমে এই মহান প্রাচীন জাতিকে ভুলিয়ে দেয় তার সনাতন জাতীয় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক জাতিসত্তা রক্ষার দায়বদ্ধতা এবং জাত্যাভিমান।

কিন্তু দুর্নীতি ও অপশাসনের পরিণামস্বরূপ কংগ্রেস দলের প্রতি জন-সমর্থন ক্রমশ কমতে থাকায় কংগ্রেস আজ একদিকে যেমন ভোটিং যন্ত্রে কারচুপি করতে সর্বত্র তোল্লা দিচ্ছে। হিন্দুস্থানকে সামরিকভাবে জয় করা যাবে না ধরে নিয়ে মুসলিম মৌলবাদীরা এখন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে জয় করতে উদ্যত। কারণ এদেশে সংখ্যা দিয়ে পার্লামেন্ট পর্যন্ত দখল করে নেওয়া যায়। একথা তারা জানে। সেই কারণে তারা প্রত্যেকটি দলে ঢুকে নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যার বৃদ্ধির দাবী জানাচ্ছে। সর্বত্র সংরক্ষণের দাবী জানাচ্ছে। আহাম্মক হিন্দু রাজনৈতিক দলীয় নেতৃত্বের নির্বুদ্ধি তার সুযোগ নিয়ে আনুপাতিক হারে সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী, গুপ্ত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডেও প্রবেশ করছে। এর পরিণামে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা গোপন নথিপত্র হাতিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্ট মুসলিম মৌলবাদী-সন্ত্রাসবাদী দলে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এ শুরু করেছে, অন্যদিকে তেমনই শুরু করেছে ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্র। মুসলিম তোষণের অপচেষ্টা আজ আইন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সর্বত্র প্রকট। হিন্দুত্ববাদীদের হেনস্থা করতে কংগ্রেস সরকার পুলিশ প্রশাসন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি, সি বি আই, গণমাধ্যম, আত্মবিক্রিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল প্রভৃতিকে কাজে লাগাচ্ছে। গোধরায় ট্রেনের মধ্যে আটক করে অসহায় হিন্দু তীর্থযাত্রীদের পুড়িয়ে মারার নৃশংসতার বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল গোটা গুজরাটে, মুসলিমদের খুশি করতে এখনও হিন্দুত্ববাদী গুজরাট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে হেনস্থা সহ্য করতে হচ্ছে, অথচ কাশ্মীরে যুগ যুগ ধরে হিন্দু নিধন হলেও সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী বা সরকারের বিরুদ্ধে আজও কোনওরকম কমিটি বা কমিশন গঠন করা হয়নি এবং হেনস্থাও করা হচ্ছে না। দেশভাগের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু নিধন হয়েছে বারবার। বাংলাদেশ গঠনের পরও তা বন্ধ হয়নি। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের চিত্ত তাতে একবারও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি।

ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান নামক একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনগুলি রাষ্ট্রীয় মদতে হিন্দুস্থানকে দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী শাসনাধীন করার নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। একথা জেনে শুনেও কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা একটি চরম গোঁড়া, পরধর্ম-অসহিষ্ণু, ভারতমাতাকে যারা 'বন্দেমাতরম্' বলার বিরোধিতা করে এমন একটি জাতীয়তা-বিরোধী ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সবই করছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দল, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভোটে জয়ী কংগ্রেস বাম, লালু, মুলায়ম ও মায়াবতীর সরকার। এইসব দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভোটে জয়ী হয়ে মুসলিমদের তোল্লা দেওয়ার জন্য সাচার কমিটি গঠন করেছে, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটি গড়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার সর্বত্র মুসলিম পদে সংরক্ষণ দিয়ে দিয়েছে; পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও সেই পথেই এগোচ্ছে। এই সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় সংরক্ষণের বিভেদমূলক আচরণের বিরুদ্ধে মামলায় হেরে গিয়েও সুপ্রিম কোর্টে লড়ছে এই অঙ্কের কংগ্রেস সরকার। এক্ষেত্রেও হিন্দু ভোটার, হিন্দু সরকার, হিন্দু অর্থ ও হিন্দু সম্পদের ব্যবহার করেই হিন্দুবিরোধী মামলা লড়া হচ্ছে। এ যেন "যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া"। সি বি আই ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধানগণ কংগ্রেসের অন্তরাত্মার নির্দেশে সময় সুযোগমতো হিন্দুনেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল কিংবা ত্রচব (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম) গঠন করে অথবা শুনানী শুরু করে। কারণ অবসরের পর বিভিন্ন তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের পদ পেতে তাতে সুবিধা হয়, তা নাহলে শ্রীরঙ্গনাথ কেমন করে মুসলিমদের জন্য এই সমস্ত ভয়ংকর দাবী অনুমোদন করতে পারে? এই সমস্ত দাবী তো স্বাধীনতা পূর্বের মুসলিম লীগের এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালের মুসলিম লবির দাবীপত্রের অধীন। এটা অবাক করার মতো ঘটনা যে হিন্দুস্থানে গরীব অনগ্রসর হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা ঋণের ক্ষেত্রে ১০-১২ শতাংশ হারে সুদ দেবে আর মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা সুদ দেবে মাত্র ৩ শতাংশ হারে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের মাইনরিটি ফিনান্স কর্পোরেশন মাইনরিটিদের ৫০০ কোটি টাকার ঋণ মুকুব করে দিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কিন্তু সংগৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন কর মারফৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছ থেকেই।

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারই মুসলিম তোষণের পুরোধা, পুনরায় ক্ষমতা দখলে রাখার স্বার্থে ২০০৮ সালে পেশ করা কেন্দ্রীয় বাজেটে কংগ্রেস সরকার সরাসরি সংখ্যালঘু উন্নয়নের স্বার্থে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। ২০০৯ সালের বাজেটে এই বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে হয় ১৭৪০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। যদিও বলা হয়েছে এই অর্থ ব্যয়িত হবে সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য; কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত যে সমস্ত জেলাগুলিতে এই অর্থ ব্যয় করা হবে বলা হচ্ছে, তা মূলত মুসলিম অধ্যুষিত বলেই অনুমান করা যায়। মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশনের অনুদান দ্বিগুণ করা হয়েছে; ন্যাশনাল মাইনরিটিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ফাইনান্স কর্পোরেশন এবং প্রি-মেট্রিক ও পোস্ট-মেট্রিক স্তরের সংখ্যালঘুদের স্কলারশিপ দেওয়ার বিধানও ২০০৯-এর বাজেটে করা হয়েছে। এ ছাড়াও বরাদ্দ হয়েছে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ন্যাশনাল ফেলোশিপ দেওয়ার জন্য অর্থ এবং রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের রেকর্ড কম্পিউটারাইজড করার জন্য কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের জন্য বিপুল অনুদান। এ ছাড়াও রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলা ও কেরলের মালাপ্পুরমে একটি করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ার জন্য ক্যাম্পাস প্রতি ২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ। এই বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে পেশ করা বাজেটে সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ আরও প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৬০০ কোটি টাকা। এবারে আরও স্পষ্ট করে ৯০টি জেলাকে মুসলিম অধ্যুষিত বলে ঘোষণা করে উন্নয়ন করা হবে। আহাম্মক, অপরিণামদর্শী হিন্দুনেতৃবৃন্দের কাছে বর্তমানে কাশ্মীরের এবং অবিভক্ত ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় হিন্দুস্থানের মধ্যেকার জেলাগুলিকে সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়ে কী পরিণতির দিকে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে তা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে।

> "এটা অবাক করার মতো ঘটনা যে হিন্দুস্থানে গরীব অনগ্রসর হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা ঋণের ক্ষেত্রে ১০-১২ শতাংশ হারে সুদ দেবে আর মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা সুদ দেবে মাত্র ৩ শতাংশ হারে।"

এসব দেখে শুনে বামপন্থীরা প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা উল্টে তারাও মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতায় সমানভাবে নেমে পড়েছে। বাজেট পেশের আগেই ঘোষণা

(এরপর ৪ পাতায়)

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা পশ্চাৎপদ কেন?

(১ পাতার পর)

আলোচনায় দেখা গেছে হিন্দু ও মুসলমান গ্রামগুলিতে রাষ্ট্রীয় পরিষেবা পৌঁছানোয় পশ্চিমবঙ্গ বাকি ভারতের চেয়ে মোটেই বিশেষ পিছিয়ে নেই। তবু এ রাজ্যের মুসলমানরা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। কেন? চটজলদি উত্তর, সরকারি অবহেলা। আবার কেউ বলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ঔদাসীন্য। সভ্যতার ইতিহাসে আদিমকাল থেকে আধুনিক যুগে দীর্ঘ যাত্রাপথে খাদ্যসংগ্রহ, পশুপালন ও শিক্ষায়, কৃষিকাজ, শিল্পায়ন প্রমুখ বিভিন্ন পর্যায় মানুষ অতিক্রম করেছে নিজের চেষ্টায়। সব জনগোষ্ঠী সব পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি। তারা পিছিয়ে পড়েছে, অনেক দেশে লুপ্ত হয়ে গেছে। নিজের গুণে মানুষ এগোয়, নিজেরই দোষে পিছিয়ে পড়ে। ভারতে হিন্দুরা বহু বছর ধরে সনাতনী কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দূরদৃষ্টিহীন, অনাচার ভ্রষ্টাচারের পঙ্কে নিমজ্জিত থেকে পশ্চাৎপদ জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। ভক্তি আন্দোলনে সারা ভারতে তার বিরুদ্ধে জাগরণ। তাই ব্রিটিশ আগমনে তাঁরা সর্বত্র নিজেদের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ত্যাগের মতো বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন, ব্রতী হয়েছেন সমাজসংস্কারে। আজ যে ভারতীয় মেধা বিশ্বে স্বীকৃত, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে একাসনে, তার পিছনে বহু শত বছরের অচলায়তন ভাঙার প্রয়াস, নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, পশ্চিমের ধ্যানধারণা গ্রহণ-বর্জনের জটিল প্রক্রিয়া রয়েছে। হিন্দু সমাজের বিবর্তন ইংরেদের কৃপায় পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা নয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া নিয়ে নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক সমীক্ষার স্থান নিয়েছে কিছু রূপকথা। যেমন বলিউড ফিল্মে সব মোগল বাদশাহ একপত্নীব্রত। তেমনি মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ হিসাবে বিজ্ঞাপিত বৃটিশ শাসনে বিজেতাদের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণে পরাজিতের স্বাভাবিক অনীহা। বাস্তবে কিন্তু মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিলেন মুঘল শাসনেই। ভারতে ৫০০ বছর মুসলমান রাষ্ট্রাধিপত্য ছিল স্তরবিন্যস্ত সামন্ত্রতন্ত্র যেখানে গুণশিক্ষার প্রয়োজন বা চেতনা শাসক চিন্তার বাইরে। ধর্মের ভাষা আরবি, রাজভাষা ফার্সি—কোনটাই মধ্য এশিয়া থেকে আগত শাসক শ্রেণীর মাতৃভাষা ছিল না—শিখতেন শুধু উচ্চশ্রেণীর আসরাফ মুসলমানরা যাঁরা বহিরাগত এবং গুটিকতক ধর্মান্তরিত উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বংশধর। দৈনন্দিন প্রয়োজনে এঁদের বাজারি ভাষা বা উর্দু ব্যবহার। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, বিশেষত বাংলায়, ছিলেন আতরাফ বা নিম্নশ্রেণির মানুষ কারণ তাঁরা ধর্মান্তরিত নিম্নবর্গীয় হিন্দু-বৌদ্ধ। শাসক শ্রেণির কাছে এঁদের উপযোগিতা দৈহিক শ্রমদানে এবং হিন্দুসমাজ ত্যাগে। যার জন্য আরবি ফার্সি উর্দু চর্চার খুব বেশি প্রয়োজন হত না। মুসলমান সারস্বত সমাজে এঁদের প্রবেশাধিকার বরাবর সীমিত।

সবচেয়ে বড় কথা যে পরিকাঠামো গড়ে তুললে এমন আমজনতার কাছে শিক্ষা পৌঁছানো সম্ভব তার সম্বন্ধে কোন চেতনাই ছিল কল্পনার অতীত। মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পাইকারি হারে পুস্তক উৎপাদন, শিল্পায়নের পথে যাত্রা বিশ্বে সর্বশিক্ষার ভিত্তি যা শুধু মুঘল ভারতে কেন সারা মুসলিম দুনিয়ায় কোথাও ১৮ শতকেও দেখা দেয়নি। এমন কি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ সহস্র রজনী পর্যন্ত কোনও মুসলমান দেশে মুদ্রিত হয়নি। হয়েছে সর্বপ্রথম বৃটিশ ভারতে এবং কলকাতা শহরে ১৮৩৯-৪২ সালে।

অপর দিকে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডে ১৫ শতক থেকে মুদ্রণ যন্ত্র ও পুস্তক প্রকাশনার দৌলতে খোলা হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য ফ্রি গ্রামার স্কুল, যার ফসল পরবর্তী শতকে সেক্সপিয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও সেকুলার শিক্ষানীতি হয়েছে অনুসৃত যার ফল জ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচন। ১৮ শতকের প্রথমার্ধেই আইজাক নিউটনের কাজ হয়ে গেছে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের বহু আগে জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যস্থাপনে পিছিয়ে পড়েছেন মুসলমানরা। পরাজিত হয়ে তাঁরা পিছিয়ে যাননি, পিছিয়ে গিয়েছিলেন বলেই পরাজিত। আর যে সব মুসলমান দেশে ইংরেজরা যাননি? যেমন আমাদের মুসলমান বিজেতাদের মাতৃদেশ মধ্যএশিয়া। বাবরের জন্মভূমি উজবেকিস্তানেও গত শতকের প্রথম পাদে সাক্ষরতার হার ছিল ০২ শতাংশ।

মুসলমান আধিপত্যের ক্রমবিলয়ে সতর্কীকরণ দেখা গেছে অটোমান সাম্রাজ্যে। সেখানে সুলতানরা দেরিতে হলেও আধুনিকমনস্কতার প্রয়োজন বুঝে বহু ধরনের সংস্কারকার্যে নিয়োজিত হয়েছিলেন ১৯ শতক থেকে। যার পরিণতি গত শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে সর্বাত্মক বিপ্লব—খলিফাতন্ত্র বিলোপ থেকে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন ও সমাজ সংস্কার। তুরস্কে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পূর্ণ বন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজি বিভাগ ইসলামি শাস্ত্র অনুশীলনের একমাত্র স্থান, শারিয়া তুলে দিয়ে নরনারীর বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতিতে সমানাধিকার ঘোষিত এবং বাস্তবায়িত, সরকারি সব প্রতিষ্ঠানে নারীদের বোরখা ও হিজাব (হেডস্কার্ফ) নিষিদ্ধ। আরও অনেক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আজ তুরস্কের মুসলমানদের সাক্ষরতার হার পশ্চিম ইউরোপের সমতুল। শিল্পায়নে সারা মুসলিম দুনিয়ায় তুরস্ক অগ্রণী।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের মুসলমানরা, বিশেষত যাঁরা সুন্নি, তাঁরা হাঁটলেন সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। তাঁরা হলেন আরবের মৌলবাদী ধর্মসংস্কারক মহম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহাবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুসরণকারী। এমন কি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার প্রয়োজনও যাঁরা বুঝলেন, গ্রহণ করলেন আধুনিক শিক্ষা, তাঁদের মধ্যেও প্রভাবশালী অংশ রয়ে গেলেন মনে মনে ওয়াহাবি। বাংলায় শিক্ষার প্রেক্ষাপটহীন দরিদ্র মুসলমানদের ওপর ওয়াহাবি প্রভাব হলো মারাত্মক। নতুন সেকুলার শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের বদলে বিজেতা বৃটিশদের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শনের ক্ষেত্র হলো হিন্দুরা। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা পূর্ববঙ্গের স্বধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিলিতভাবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী সব মুসলমানদের জামানত জব্দ করিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগকারী মুসলিম লিগকে জয়যুক্ত করেছেন। এমন সন্দেহাতীত বিজয় লিগ আর কোথাও পাননি। এ বঙ্গের শিক্ষিত মুসলমানদের প্রতিনিধি অক্সফোর্ড ফেরৎ হোসেন শহীদ সুরাবর্দির প্রধান মন্ত্রীত্বে সুপরিকল্পিত ভাবে সংগঠিত হয়েছে কলকাতাসহ সারা বাংলায় পাকিস্তানের দাবিতে ভয়াবহ দাঙ্গা লুঠতরাজ হত্যা ধর্ষণ। পাকিস্তান হলো। পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখ বনাম মুসলমানের রক্তাক্ত সঙ্ঘর্ষে দুপক্ষই পারস্পরিক জনবিনিময় করলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা পাকিস্তানের জন্য ভোট দিয়ে, লড়াই করেও রয়ে গেলেন ভারতে, এ বাংলায়। অথচ অমুসলমান রাষ্ট্র, অমুসলমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের আর বিকৃত মানসিকতার বিশেষ পরিবর্তন হলো না। তাঁদের শিক্ষা মানেই মাদ্রাসা খুলতে হবে—যদিও বিশ্বে শুধু পশ্চিমীই নয়, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম সহ সারা অমুসলমান দুনিয়া সেকুলার শিক্ষাগ্রহণ করেছে। ধর্মকেন্দ্রিকতার জন্য অমুসলমান রাষ্ট্র ভারতের সরকারি নীতি জন্মনিয়ন্ত্রণ বড় সংখ্যক সুন্নি মুসলমানদের কাছে বর্জনীয়। ফলে ভারত সরকারের হিসেবে ১৯৫১-২০০১ অর্ধশতকে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩১০.১৩ শতাংশ, যেখানে হিন্দু সংখ্যাবৃদ্ধির হার ১৯৮.৫৪। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত দেড় থেকে পৌনে দু'কোটি হিন্দু উদ্বাস্তুর বিরাট অংশ। আশ্চর্য ব্যাপার হলো একই কালপর্বে (১৯৫১-২০০১) বাংলাদেশের সরকারি হিসাবে সেখানে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৪৪.৬৮ শতাংশ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধির হারের চেয়ে ঢের কম। ভারতের মতো জনসংখ্যাপীড়িত রাষ্ট্রে যেখানে সকলের সুযোগসুবিধা সীমাবদ্ধ সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের এমন বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা কী করে সম্ভব? বিশেষ করে যখন পূর্বপাকিস্তান-বাংলাদেশে একই কালপর্বে সংখ্যালঘু হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির হার মোটে ২৩.১৬ শতাংশ? দুই বাংলার জনবিন্যাসে ধর্মভিত্তিক প্রকট অসাম্যের ফলে এ রাজ্যে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে গভীর সংকট। বিশাল সংখ্যায় খেপে খেপে উৎপাটিত হিন্দু জনস্রোতে এ রাজ্যে অর্থনীতি বিধবস্ত, সমাজ বিপর্যস্ত, রাজনীতি আত্মঘাতী। সবচেয়ে অবমূল্যায়িত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিল্পায়ন। ভারতে মেধার প্রতিযোগিতায়, বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে আজ বাঙালি পশ্চাপদ। শুধু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যায় বাঙালি শীর্ষস্থানে। সংখ্যাগরিষ্ঠের এমন কোণঠাসা অবস্থায়—যার জন্য সংখ্যালঘুর দায়িত্ব অবশ্যই ছিল—তাতে ভোটব্যাংক রূপে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ছাড়া আর কোনও মাথাব্যথা মুসলমানদের দেখা যায়নি। তাঁরা আধুনিক শিক্ষার দাবি করেন না, সমাজসংস্কারের দিকে পা বাড়ান না। নতুন সরকার এলে কাগজে প্রচুর পত্রে দেখি শুধু মাদ্রাসা স্থাপনের দাবি। সম্প্রতি কিছু আধুনিক ভেকধারী বিদ্যায়তন গজিয়ে উঠেছে যেখানে ক'টি সাধারণ বিষয় পাঠ্য, সঙ্গে প্রচুর ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন। তৈল-স্বর্ণে বলীয়ান ওয়াহাবি সৌদি আরবের পৃষ্ঠপোষকতায় কি না কে জানে, ওপার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত ৬০ হাজার মাদ্রাসা। এ পারেও তার ঢেউ বলাবাহুল্য এসে আছড়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে হাতে গোনা যে ক'জন আধুনিকমনা সংস্কারপন্থী মুসলমান আছেন, তাঁরা নিঃসঙ্গ এবং অসহায়। মুসলমান আমআদমি তাঁদের অনুসরণ করেন না। ক্ষমতাশালী মুষ্টিমেয় তাঁদের অবজ্ঞা করেন। যে রাজ্যে একজন উচ্চশিক্ষিত মেধাবী মুসলমান ভারত সরকারের সর্বোচ্চ চাকরি করে অবসরজীবনে একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজি দৈনিকে নিবন্ধ লিখে নিজেকে সগর্বে মৌলবাদী ঘোষণা করেন এবং কোনও মুসলমান তাঁকে সমালোচনার সাহস ধরেন না, সে রাজ্যে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতাই স্বাভাবিক কারণ, এটা একটা হাতিয়ার। লক্ষ্য যখন উন্নয়ন নয় আধিপত্য স্থাপন।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত খবর চীনের কাছে

(১ পাতার পর)

২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে নভেম্বরের মধ্যে দলাই লামার অফিসের ১৫০০টি ই-মেল (চিঠি) খুলে দেখা হয়েছে। হ্যাক করার ক্ষেত্রে সরকারি গোপন নথিপত্র এবং উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারদের কম্পিউটার এবং ব্লগকেই নিশানা করা হয়েছে।

নয়াদিল্লীর মতে, চীন ভারতের বিরুদ্ধে সাইবার যুদ্ধেও অবতীর্ণ। বিশেষ করে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নতুন নতুন মিসাইল অস্ত্রপ্রযুক্তি জানার জন্য মরিয়া। যদিও চীন ভারতের আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ে ওয়াকিবহাল। চীন সরাসরিভাবে সবই অস্বীকার করেছে।

ভারত এখন গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আরও কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

ভারতের নজরদারি

(১ পাতার পর)

জন্য সর্বদা নজরে রেখে নিরাপদ গতিবিধি বজায় রাখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত বর্জ্য-সঙ্ঘর্ষ আটকানোর জন্য কোনও প্রযুক্তি তৈরি হয়নি। তবে মহাকাশে পরিত্যক্ত বর্জ্য পরিষ্কারের বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রীরাধাকৃষ্ণণ।

'ইসরো' শীঘ্রই তৃতীয় মিশন ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ২২০০ কিলোগ্রাম ওজনের ক্রায়োজনিক ইঞ্জিনযুক্ত পরীক্ষামূলক উপগ্রহ জি এস এল ভি-ডি৩ মহাকাশে প্রেরণ করবে বলে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ জানিয়েছেন।

মুসলিম তোষণের ফ্রি-স্টাইল প্রতিযোগিতা

(৩ পাতার পর)

এসব দেখে শুনে বামপন্থীরা প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা উল্টে তারাও মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতায় সমানভাবে নেমে পড়েছে। বাজেট পেশের আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে সর্বত্র মুসলিমদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হবে। বাজেটেও মাদ্রাসা গুলির জন্য বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। অথচ এই মাদ্রাসাগুলিকেই বামফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রী একসময় রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া বলে এক সময় উল্লেখ করেছিলেন। অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ আরো ৮১ কোটি টাকা বাড়িতে দিয়েছেন। কারণ রাজ্য সরকার মুসলিম জনসংখ্যার বেশীর ভাগ অংশকেই অনগ্রসর শ্রেণীর ছত্থচট্টগ্ন বলে স্বীকৃতি মুসলিমরা অনগ্রসর হিন্দু ছিল। ধর্মান্তরিত হয়ে তারা এখন পুরস্কৃতই হলো। এখনও সে সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ হিন্দু হয়েই আছেন তারা যদি ভবিষ্যতে মুসলিম ধর্মে যাওয়ার জন্য লাইন দেয় তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না।

এই হলো কংগ্রেস ও বামপন্থী নেতাদের চরিত্র। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গর প্রধান বিরোধী নেতৃত্ব আরও বেশী মুসলিমপ্রেমী। তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে তিনি ক্ষমতায় এলে মুসলমানদের সর্বত্র নিয়োগ করবেন। প্রেম করতে গিয়ে বাবা-মায়ের বিরোধিতা আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। নিজ ধর্মের মধ্যেও এ বিরোধীতা হয়। তার ফলে আত্মহত্যা বা পালিয়ে যাওয়া নতুন কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু হিন্দু মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে তারা বাবা-মায়ের বিরোধিতায় আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে হিন্দু পিতাকে যেভাবে হেনস্থা করেছেন তৃণমূল নেত্রী, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। এহেন বিরোধী নেত্রীর কাছ থেকে হিন্দু ভোটাররা কী আশা করতে পারে? হিন্দু নেতানেত্রীগণও তেমনি বোধবুদ্ধি হীন। যেমন—বেকুব কাক কোকিলের পাড়া ডিমে তা দিয়ে কোকিলের বাচ্চা ফোটায়; পরে সেই বাচ্চাই লায়েক হলে কাক-মাতাকে ফেলে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায় তাদের গোষ্ঠীতে। হিন্দু জনগণ এবং তার নেতা-নেত্রীগণকে যতই বোঝান তার ঠিক উল্টো বুঝবে। যেমন তুলসীদাস রামায়ণে রাবণ-পুত্র প্রহস্ত্য বলেছিলেন—'হিত মত তো দিন আগত ফেঁসে। কাল বিবস কঙ্গু ভেসজ জেসেঁ'। অর্থাৎ, হিতকথা তোমার তেমন ভাল লাগিল না, যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে ঔষধ ভাল লাগে না।

রাজ্য রাজনীতি

এরাজ্যে জনহিতৈষী তৃতীয় শক্তির উত্থান প্রয়োজন

নিশাকর সোম

ক্ষমতার চিটেগুড়ের ব্যাপারীদের মুখোশ খসে পড়ে গেছে, আসল মুখটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সিপিএম-এর কলকাতার মেয়র কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর রোষানলের শিকার হয়েছেন। তিনি (মেয়র) সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী সব খবর জানেন না। সাংঘাতিক কথা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী না-জেনে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সম্পর্কে মন্তব্য করেন? নেপথ্যের সংবাদ মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে পুনরায় প্রার্থী হতে চেয়েছেন। শুধু বিকাশবাবু নন, আরও দু'তিনজন বর্তমান সিপিএম কাউন্সিলার পার্টিকে জানিয়েছেন যে তাঁদের বাদ দেওয়া চলবে না। তাতে নির্বাচনী ফলাফল খারাপ হবে। এঁদের মধ্যে মহিলা কাউন্সিলার-এর সংখ্যাই বেশি।

প্রসঙ্গত, ৮১টি পৌরসভার নির্বাচনে পার্টি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। একথা সিপিএম-এর সদ্য সমাপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ধ্বনিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির একাধিক সদস্যের মতে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম-এর নেতৃত্ব ব্যর্থ। এঁদের নিজেদেরই সরে যাওয়া উচিত। প্রায় প্রতিটি সভাতে নিন্দিত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা অতি বিষম বস্তু—এই আপ্তবাক্যটিকে মনে মনে পূজা করছেন এ-রাজ্যের সিপিএম-নেতৃত্ব। তাই মাঝেমধ্যে কোনও নেতার যেমন—রেজ্জাক, মাননীয় স্পীকার (বিধানসভা) এবং গৌতম দেবের কথাতে তা বেরিয়ে আসছে।

ঠিক যেমন বেরিয়ে আসছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ এবং বীরভূমের পুরপ্রতিনিধিদের কণ্ঠ থেকে বিরোধিতার সুর। পৌরনির্বাচন নিয়ে সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির আলোচনাতেও কঠিন চ্যালেঞ্জ-এর কথা উঠে এসেছে। এরজন্য পার্টিকর্মীদের হতাশা কাটিয়ে কাজে নামতে বলা হয়েছে। ভবি ভোলবার নয়। আজকে নির্দেশ দিয়ে পার্টিকর্মীদের কাজে নামানো সহজ নয়। কারণ নির্দেশকারী নেতৃত্বের বিশ্বাস - যোগ্যতাই নষ্ট হয়ে গেছে।

সিপিএম-এর কলকাতা জেলা কমিটিতে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। তবে তৃণমূলের বর্তমান হেভিওয়েট কাউন্সিলারদের বিরুদ্ধে যুব-নেতাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা। তা' নইলে নিশ্চিত বিপর্যয় জেনেও অধিকারের স্বত্বের জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক বেশি আসন দাবি করেছে! আর এস পি-এর অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। তাদের পুরানো প্রার্থীরা কেউই দাঁড়াতে রাজি হচ্ছেন না।

সম্প্রতি ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ-এর বিরুদ্ধে উলুবেড়িয়ার ফরওয়ার্ড ব্লকের একাংশ পোস্টার প্রচারে নেমে গেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিগত লোকসভা নির্বাচনে এই রবীন্দ্র ঘোষ মহাশয় নাকি সিপিএম-প্রার্থী হান্নান মোল্লার বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন বলে অভিযোগ শোনা গেছিলো। শুধু ফরওয়ার্ড ব্লকের রবীন্দ্র ঘোষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ প্রকাশ্যেই তো অশোক ঘোষ বলেছিলেন—"সিপিএম-এর কর্মীরা লুম্পেন। মমতা আমাদের নেত্রী।"

এ-রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম এসেছিলেন। মমতা-পন্থী সংবাদপত্র সরবে ঘোষণা করছে—'মমতার চাপে' এসেছেন। বামফ্রন্টে আলোচনায় উঠে এসেছে যে—যত নষ্টের মূল হলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এদিকে স্টিফেন কোর্ট সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-এর বক্তব্যকে খণ্ডন করে বিধানসভায় বুদ্ধ-ভক্ত অশোক ভট্টাচার্য বক্তব্য পেশ করেছেন। স্টিফেন কোর্টের 'বে-আইনি' নির্মাণ নিয়ে অন্য দুই ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে সরকারি কাজে এ-রাজ্যে কোনও সমন্বয় নেই এবং মুখ্যমন্ত্রী কোনও কথা বলার আগে তথ্য সংগ্রহ না-করে বেবাক কথা বলে একের পর এক বিপদ সৃষ্টি করে চলেছেন। তবুও তিনি ক্ষমতার চিটে গুড় থেকে সরতে চাইছেন না। বাম শরিকদের ভাষায় বামফ্রন্টকে তিনি কি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান? বামফ্রন্টের মধ্যে ৮১টি পুরসভার নির্বাচন নিয়ে জেলায় জেলায় অনৈক্য দেখা গিয়েছে। বিমান বসু ব্যর্থ হয়েছেন এই অনৈক্য দূর করতে। এতো বিমান বসুদের পূর্বকথার উত্তরপর্বের প্রতিক্রিয়া। এতদিন তো বিমান বসুরা বামশরিকদের শেষ করার ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই বামশরিকরা বিগত লোকসভা নির্বাচন থেকেই সিপিএমকে 'কাট টু সাইজ' করার জন্য যে-কোনও দলের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে চলেছে এবং প্রকাশ্যে তো বক্তব্য রাখার ব্যাপারে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেন আর এস পি মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী। এখন পুর-নির্বাচনে বাঁচার জন্য বিমান বসু 'ঐক্য জোরদার' করার আহ্বান জানাচ্ছেন। বিমান বসু পার্টির ঐক্য রাখতে ব্যর্থ। তিনি আবার বাম ঐক্য সংহত করবেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিমান বসুকে রাজ্য কমিটির বেশির ভাগ সদস্য আর তেমন গুরুত্ব দেন না। তাঁদের মতে, বিমান বসুর তালজ্ঞান নেই। আজকে সিপিএম-এ বুদ্ধ-নিরুপম-বিমান-বিনয়দের নিচের তলায় বেশির ভাগ সিপিএম-কর্মী অপসারণ চাইছেন। পুর-নির্বাচন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পার্টিকে সামগ্রিকভাবে সক্রিয় করার ক্ষমতা-যোগ্যতা-বিশ্বাসযোগ্যতা এই চতুষ্টয়ের নেই। চীনের পার্টির ভাষায় গ্যাং অফ ফোর—দুষ্ট চতুষ্টয় দূর হটো—এই আওয়াজ নিচের তলায় ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু স্টালিনের কায়দায় এঁরা ক্ষমতায় দিব্যি বসে থাকছেন! ফল হাতে-হাতে পাচ্ছেন। কিন্তু বেহায়ার নেই লাজ—নেই অপমানবোধ। সিপিএম-এর নেতা-কর্মীদের দুর্নীতির দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যান নির্মল মুখার্জির কীর্তির কথা সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে গেছে। হলদিয়াতে লক্ষ্মণ শেঠের ঘনিষ্ঠ অশোকবাবু সম্পর্কে বিরাট অভিযোগ সিপিএম রাজ্য-নেতৃত্বের কাছে এসেছে। কিন্তু রাজ্য-নেতৃত্বের সাহস হচ্ছে না কিছু করার। পুর-নির্বাচনের আগে রাজ্য সিপিএম নেতৃত্ব কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাকে স্পর্শ করার সাহস দেখাতে পারবেন না। কারণ কম্বলের লোম বাছতে গেলে গোটা কম্বলই ফেলে দিতে হবে। এ অবস্থায় এরাজ্য সিপিএম-এর হাতে সুস্থ থাকতে পারে না।

এ-রাজ্যে যখন চাকরির জন্য হাহাকার হচ্ছে তখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ রসিকতা করে ৪০ বছরের ছুঁই ছুঁই দের ডাক পাঠাচ্ছে এবং তাঁদেরকে ইন্টারভিউতে জানানো হচ্ছে "কিসিং ফোরটি—কাজ দেওয়া যাবে না।" এদিকে বছর অনুযায়ী নাম পাঠানোর যান্ত্রিক নীতির ফলে লক্ষ লক্ষ বেকারকে ৪০ বছরে পৌঁছে দিচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। এই বেকার বাহিনী প্রত্যেকেই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে যাবেনই। কোনও কোনও মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠরা বেকারদের বুদ্ধি দেন—"ঘুষ দিলেই এক্সচেঞ্জ নাম পাঠাবে। দু-এক হাজার দিয়ে দিন।" এ-রাজ্যকে সিপিএম এক অতল গহ্বরে নিয়ে গেছে—তাইতো সিপিএম-এর হাতে এ-রাজ্য নিরাপদ নয়।

সিপিএম-বামফ্রন্টের বিকল্পে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট-এর কথা তোলা হচ্ছে। সেই জোটের অবস্থাটা সিপিএম-বামফ্রন্টের থেকে মোটেই ভাল নয়। তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে শুধু কবীর সুমন নন, একাধিক তৃণমূল নেতা-

(এরপর ৬ পাতায়)

> "এ-রাজ্যের দুই যুযুধান শিবিরের অবস্থা দেখা গেল। দুই শিবিরই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। এঁরা কেউ মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবেন না। শুধু ক্ষমতার চিটেগুড়ের ব্যাপারী হতে চান। তাই রাজ্যের মানুষের মঙ্গলকামী জনহিতৈষী শক্তিকে গড়ে তুলে তৃতীয় শক্তির অভ্যুত্থান নিশ্চিত করা দরকার।"

অন্য রকম

মজার পাঠশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মধ্যপ্রদেশের এক কোটির বেশি স্কুল ছাত্রছাত্রীর কাছে এই নতুন শিক্ষাবর্ষ খানিকটা অন্যরকম। এই শিক্ষাবর্ষে মধ্যপ্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু নতুন পরিকল্পনা রূপায়িত হতে চলেছে। ছাত্রেরা স্কুলে যাবে খালি হাতে। ব্যাগভর্তি বইয়ের বোঝা তাদেরকে আর বইতে হবে না। শুধু তাই নয়, স্কুলে গিয়ে বই পড়তেও হবে না।

বাচ্চাদের কাছে এই ঘটনাটি খানিকটা অবাক করলেও এতে তারা বেজায় খুশি। কেননা পড়াশোনার হাত থেকে তারা খানিকটা চাপমুক্ত হতে পারবে। এই শিক্ষাবর্ষের প্রথমদিনে তাদের বলা হয়েছে যে পরের সপ্তাহ অবধি তারা যা ইচ্ছা করতে পারে। তারা গ্রামে নিজেদের ইচ্ছা মতো ঘুরে বেড়াতে পারে কিংবা প্রজাপতির পিছনে ধাওয়া করতে পারে অথবা তাদের ঠাকুর্দা বা ঠাকুমার কাছে বসে গল্পও শুনতে পারে। এপ্রিলের ৮ তারিখে স্কুলের তরফ থেকে তাদের বই দেওয়া হবে। তবে সেই বই তারা ঘরে নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ একমাস ধরে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ব্যাগের দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে। স্কুল তার পুরোনো চিরাচরিত ধারায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা শুরু করবে গরমের ছুটির পর থেকে।

মধ্যপ্রদেশের শিক্ষা মন্ত্রী অর্চনা চিতনিস -এর মতে স্কুলের পঠন-পাঠন ব্যবস্থাকে নতুনভাবে বিন্যাসের ফলে শিশু মস্তিষ্কের উপর পড়াশোনার যে বেশি চাপ থাকত তা অনেকটাই কমবে। আর এতে লেখাপড়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ বাড়বে। চিতনিস এই প্রক্রিয়াটিকে জেলাস্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মন্ত্রীর মতে সর্বশিক্ষা অভিযানের এই নতুন মতাদর্শকে সমস্ত স্কুলে পৌঁছে দেওয়াই তার প্রধান লক্ষ্য।

শিক্ষামন্ত্রী চিতনিস বলেছেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে এধরনের নতুন ভাব-ভাবনার ফলে পূর্বে শিক্ষার বিস্তার নিয়ে যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেকটাই দূর হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেছেন যে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক ভাবে তৈরি করবার জন্য পরিবারের সকলকে আরও বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। ছোটদের সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে। শিশুদের কাছে এইসব অভিজ্ঞতাই স্কুলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাকে যথোপযুক্ত করে তুলবে।

ছাত্রছাত্রীদের অনুমতি দেওয়া হবে যাতে তারা বাইরে ঘুরে পশু, পাখী, গাছপালা প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য যোগাড় করতে পারে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারে। ভারতীয় ইতিহাস এবং ভূগোলকে সঠিক ভাবে জানতে পারে। প্রাক্তন ছাত্রদের গ্রন্থাগারে গিয়ে পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। এইভাবেই একজন শিশুর সঠিক বিকাশ সম্ভব।

খাণ্ডোয়ার ডি. পি. সি. সঞ্জয় মাণ্ডলোইর মতে এটিই হচ্ছে "মজার পাঠশালা"—যেখানে ছাত্রছাত্রীদের অধিকারকে সবার আগে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মর্জিমাফিক চলবে, সেখানে শিক্ষা সত্যিই মজার ব্যাপার।

দেবাস-এর ডি. পি. সি. বিজয় শ্রীবাস্তব এই ভাবনা সঠিক এবং ভালো এই দুইভাবেই অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে ছাত্ররা এতে খুব উপকৃত হবে। যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে তারা নিজেকে আরও বিকশিত করতে পারবে। শিক্ষার এই নতুন ভাবনা ছাত্রদের ক্লাসরুমের গণ্ডী থেকে বের করে বাইরের জগতের সঙ্গে তাদেরকে পরিচিত করে তুলবে।

বাংলাদেশকে ঘাঁটি করে আফগানিস্তান থেকে আরাকান পর্যন্ত জেহাদি নেটওয়ার্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা।। সেই ১৯৯১ সাল থেকে কমপক্ষে ১৫টি বিদেশী জেহাদি ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে ভারত সহ কয়েকটি দেশে জেহাদি কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এপর্যন্ত ধৃত জেহাদি উগ্রপন্থীদের জেরা করেই এই বিষয়ে নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা এই সব জেহাদিরা মূলত আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং মায়ানমারের বাসিন্দা। এদের কাছে রয়েছে একাধিক দেশের জাল পাসপোর্ট। জেহাদি সন্ত্রাস ছাড়াও এরা পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসা জাল ভারতীয় নোট এবং আমেরিকান ডলারের কারবার করে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়। বাংলাদেশে ধৃত জেহাদিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে যে, পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা এদেরকে অর্থ, অস্ত্র সহ সবরকম সাহায্য করে। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'ডেইলি স্টার'-কে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা এই খবর জানিয়েছে। বাংলাদেশের গোয়েন্দারা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গেছে। দু'রকম ভাবে ভারতে ঢুকছে পাকিস্তান ভিত্তিক জেহাদি গোষ্ঠীর ক্যাডাররা। প্রথমত, তারা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ এবং তারপর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকে। আবার অনেক জেহাদি ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকে সেখানে জাল বাংলাদেশী পাসপোর্ট বানিয়ে পাকিস্তানে পাড়ি দেয়। পাকিস্তানে জেহাদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। বিশেষত, আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরকের ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্যই তারা পাকিস্তানে যায়। এদিকে বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের প্রধান হাসান মাহমুদ খন্দকারের বক্তব্য হলো—'দেশি (বাংলাদেশী) বিদেশী সন্ত্রাসবাদীদের জন্য বাংলাদেশ আর স্বস্তিদায়ক স্থান নয়।'

যদিও বাস্তব অন্য কথা বলছে। পাকিস্তানে তৈরি জাল ভারতীয় টাকা এবং আমেরিকান ডলার দুবাই হয়ে বাংলাদেশে আসছে এবং তারপর তা ভারতে পাঠানো হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মালদা, মুর্শিদাবাদে অনেক জালনোট ধরা পড়েছে। তবে এসবই হিমশৈলের উপরিভাগ মাত্র। জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের এক শক্তিশালী সিন্ডিকেট ভারতে এই জালনোট ও ডলার পাচারে যুক্ত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উচ্চশ্রেণীর বাংলাদেশী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, "আমরা জালনোট পাচারের তিনটি গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করতে

ধৃত এক বাংলাদেশী জঙ্গি।

পেরেছি। প্রত্যেক গোষ্ঠীতে ৫০ জন করে সদস্য রয়েছে। বাংলাদেশের জনৈক মজুমদার একটি গোষ্ঠীর প্রধান, পাক নাগরিক সরফরাজ ও মহম্মদ দানিস অন্য দু'টি গোষ্ঠী পরিচালনা করে।"

সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে মানি ট্রান্সফার করার ঘটনায় রেজয়ান নামে এক পাকিস্তানীকে বাংলাদেশ পুলিশ আটক করেছে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের লড়াই শেষ হলে বিভিন্ন বিদেশী উগ্রপন্থী মুসলিম গোষ্ঠী বাংলাদেশে এসে ডেরা বাঁধে। বেশ কিছু বাংলাদেশীও সম্ভবত আফগান যুদ্ধে (রাশিয়ার বিরুদ্ধে) যোগ দিয়েছিল। বাংলাদেশভিত্তিক জেহাদি সংগঠন হুজি (হরকত উল জিহাদ-ই-ইসলামি) তাদেরকে সবরকম সহযোগিতা করেছিল। খালেদা জিয়ার বি এন পি ও ইসলামি ঐক্য জোট ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ জুড়ে তাদের রমরমা হয়।

১৯৯১-১৯৯৮ এবং ২০০১-২০০৫ পর্যন্ত কোনওরকম বাধা ছাড়াই ওই গোষ্ঠী তাদের কাজ-কারবার চালিয়ে গিয়েছে। বি এন পি ও জামাত জমানায় (২০০৯-০৬) প্রশাশনের নাকের ডগায় তারা সবরকম গতিবিধি চালিয়ে যায়। কিছু জেহাদি ধরা পড়লে তাদেরকে 'সেফ প্যাসেজ' দেওয়া হয়।

পাকভিত্তিক জেহাদি গোষ্ঠীগুলির অন্যতম হলো লস্কর এ তৈবা, তেহরিক-এ-জেহাদ-এ-ইসলামি কাশ্মীর, হরকত-উল-মুজাহিদিন, হরকত-উল-জেহাদ-আল-ইসলামি, হিজব-উল-মুজাহিদিন, হিজব-এ-ইসলামি, জামাত-উল-মুজাহিদিন, হরকত-উল-আনসার, জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট, জৈশ-এ-মহম্মদ, ভারতে সক্রিয় আসিফ রেজা কমান্ডো ফোর্স এবং মায়ানমার ভিত্তিক রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন, আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এবং ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অফ্ আরাকান। গত বছর মুফতি ওবাইদুল্লা এবং মৌলানা মনসুর আলির গ্রেপ্তারের পর এ আর সি এফ ও এলইটি-র যোগাযোগের কথা জানা যায়।

শিলিগুড়িতে ধৃত মণিপুরী জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মণিপুরে সক্রিয় উগ্রপন্থী সংগঠন 'কাংলেই ইয়াল কান্না লুপ' (Kanglei Yawol Kanna Lup)-এর কয়েকটি ব্যাঙ্ক একাউন্টের সন্ধান সম্প্রতি গুয়াহাটি শহরে পাওয়া গেছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিষিদ্ধ সংগঠনটির কমান্ডার ইন্ চীফ্ নাইথোইজাম রাজেন সিংহ ওরফে তোম্বা ওরফে কোইরেঙ এর নামে গুয়াহাটির 'আই সি আই সি আই' ব্যাঙ্কে দুটি একাউন্টের সন্ধান পেয়েছে।

গত ৩১ মার্চ স্বরাষ্ট্র দপ্তর বেআইনী গতিবিধি নিরোধক আইন মোতাবেক ১৮টি ব্যাঙ্ক একাউন্টকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অর্থ যোগানের কারণে বন্ধ করে দিয়েছে। এর মধ্যে চারটি একাউন্টই নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন কে ওয়াই কে এল-এর। গোয়েন্দা সূত্র মতে উপরোক্ত রাজেন সিংহ-এর গুয়াহাটির ঠিকানা হলো—ফ্ল্যাট-১ সি, পুণ্য অ্যাপার্টমেন্ট-আর জি বড়ুয়া রোড, গণেশগুড়ি, গুয়াহাটি। এই ঠিকানা ব্যাঙ্কের খাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। একজন অফিসারের কথায় রাজেন সিংহ-এর মতো একজন মোস্ট ওয়ান্টেড উগ্রপন্থী কী করে একের পর এক ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলেছে তা বিস্ময়ের।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে—ওই একাউন্টগুলো থেকে রীতিমতো টাকা লেনদেন হয়েছে। টাকা দেওয়া হয়েছে, তোলার টাকা জমা হয়েছে। গোয়েন্দা অফিসারদের সন্দেহ—গুয়াহাটির বিপুল জনসংখ্যা, বৈশ্বিক জনসংস্কৃতি প্রভৃতি কারণে অনেক উগ্রপন্থী সংগঠনের ওখানে ব্যাঙ্ক একাউন্ট থাকতে পারে। এদিকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ব্যাঙ্কগুলোকে নতুন একাউন্ট খোলার ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। যদিও ব্যাঙ্কগুলো এব্যাপারে নীরব। এদিকে ব্যাঙ্কের নথিপত্র অনুযায়ী জঙ্গি নেতা রাজেন সিংহ নিজেই গত তিনবছর যাবৎ গুয়াহাটিতে অবস্থান করেছে। অথচ মণিপুর পুলিশ অথবা অসম পুলিশ তার টিকিটিও ছুঁতে পারেনি।

গত ১৪ মার্চ কে ওয়াই কে এল-এর ৫৭ বছর বয়সী কম্যান্ডার ইন্ চীফ্-কে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরের খাপরাইল বাজার থেকে তার নেপালী পত্নী ও দুই কন্যা সহ গ্রেপ্তার করা হয়। রাজেন সিংহ-এর কাছ থেকে স্যাটেলাইট ফোন এবং অনেক আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া গেছে। রাজেন সিংহ-এর ডেবিট কার্ডের নম্বর হলো—৬৩৪৩০১৫২৭৭৮২ এবং ওই কার্ড ব্যবহার করে গত বছর ২৫ নভেম্বর সে একটি জিনিস কিনতেই ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে উগ্রপন্থী নেতারা কিরকম বিলাসবহুল জীবন-যাপন করেন। গুয়াহাটির বিভিন্ন শোরুম থেকেও রাজেন সিংহ ভালো পরিমাণে কেনাকাটা করেছে বলে জানা গেছে। আবার এই কে ওয়াই কে এল জঙ্গি গোষ্ঠী দুর্নীতিমুক্ত সমাজগঠনের কথা বলে। মণিপুরের পূর্ব ইম্ফল, বিষেণপুর, থৌবাল এবং ইম্ফল পশ্চিম জেলায় কে ওয়াই কে এল জঙ্গিরা সক্রিয়।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা ব্যাপক অর্থ ও বিলাসবহুল জীবনযাপন অনেক উগ্রপন্থী দলের জীবনরেখা। নেতারা বহাল তবিয়তে থাকে আর সাধারণ ক্যাডাররা দুর্বিসহ কষ্টে জীবনযাপন করে নেতাদের সেবা করে যায়।

ব্যাঙ্গালোর পুরনির্বাচনে বিজেপির জয়-জয়কার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কলকাতার পৌরসভা নির্বাচন যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, ডান-বাম নির্বিশেষে সমস্ত দলগুলি কলকাতার পুরভবন দখলের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে, ঠিক সেই সময় ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ব্যাঙ্গালোর পৌরসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রথমবার বিজেপি-র জয় খানিকটা হলেও এ রাজ্যে বিজেপি-র নেতৃত্বকে চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে। বিজেপি-র এই অবিশ্বাস্য জয় তথ্যপ্রযুক্তির শিল্পতালুক-কে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও উন্নত করে তুলবে বলে কর্ণাটক সরকারের দাবী।

ব্যাঙ্গালোর পৌরসভার মোট ১৯৮টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই জয়লাভ করছে ১১২টি আসনে। অর্থাৎ বিজেপি এখন এককভাবেই এই শহরের দেখভাল করবে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্গালোরে এই জয় বিজেপি-র দাক্ষিণাত্য মুকুটে একটি নতুন পালক যোগ করল।

২০০৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ব্যাঙ্গালোর পুর-এলাকায় ২৮টি আসনের মধ্যে ১৭টি-তে জয়লাভ করেছিল।

ব্যাঙ্গালোরের পৌর নির্বাচনে কংগ্রেস মোট ৬৪টি আসন পেয়ে বিরোধী আসনে বসেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ.ডি. দেবেগৌড়ার জনতা দল (সেকুলার) মোট ১৫টি আসন পেয়েছে। অন্যান্য দলগুলি মাত্র সাতটি আসন পেয়েছে।

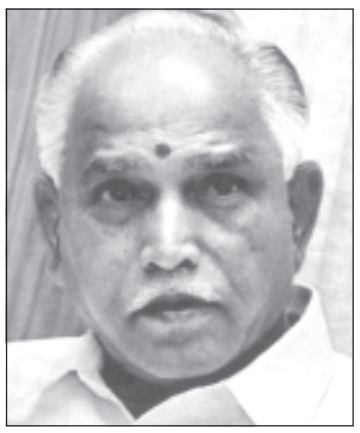

ইয়েদুরাপ্পা

বিজেপি-র এই জয় কর্ণাটকের বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী ইয়াদুরাপ্পার হাত অনেকটাই মজবুত করেছে। বিশেষত কয়েক মাস ধরে চলা বিজেপি-র অন্তর্কলহ, বিধায়কদের মধ্যে নানান বিষয় নিয়ে মতান্তর এবং রেড্ডি ভাইদের বিবাদ সত্ত্বেও বিজেপিকে এই জয় সাংগঠনিক দিক থেকে অক্সিজেন জোগান দেবে।

ইয়াদুরাপ্পার বক্তব্যে স্পষ্ট যে উন্নয়নের দিক থেকে তিনি ব্যাঙ্গালোরকে ভারতীয় সিলিকন ভ্যালি রূপে গড়ে তুলবেন। ব্যাঙ্গালোরের নিজস্বতাকে আরও ভালো করে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরাই তার প্রধান লক্ষ্য। ইয়াদুরাপ্পার মতে শিক্ষা, সংস্কৃতি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যাঙ্গালোরের পরিকল্পনা গঠনের ক্ষেত্রে আগামী তিন বৎসরে প্রায় ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। বিজেপির এই জয়কে ইয়াদুরাপ্পা ব্যাঙ্গালোরের সাধারণ মানুষের জয় বলে অভিহিত করেছেন।

গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় একমাত্র কর্ণাটকেই ২৮টি আসনের মধ্যে ১৯টি আসনে জয়লাভ করেন। ব্যাঙ্গালোরে বিজেপি-র এই জয় সাংগঠনিক দিক থেকে যেমন তাদের শক্তিশালী করবে, তেমনি মানসিক দিক থেকেও দৃঢ়তা প্রদান করবে।

তৃতীয় শক্তির উত্থান প্রয়োজন

(৫ পাতার পর)

বিশেষ করে বীরভূমের এক নেতা প্রকাশ্যে অভিযোগ হেনেছেন। এ-ছাড়া কংগ্রেস-তৃণমূল ঐক্য ২০১১ পর্যন্ত রাখতে সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশ। কারণ রাজ্যমন্ত্রিত্বের অংশ না পেলে রাজ্যে ক্রমক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেসের অবলুপ্তি বাঁচানো যাবে না। তবে ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর সোনিয়া সংহার মূর্তি ধারণ করবেনই। যেমন মহারাষ্ট্রে এন সি পি-কে শেষ করার দিকে এগিয়েছেন। তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের ঐক্যের তো ওয়ান পয়েন্ট প্রোগ্রাম—ক্ষমতা দখল।

এই জোটের মধ্যে জেলায় জেলায় কংগ্রেস-নেতাদের ক্ষোভ প্রকাশ হচ্ছে। মালদহে গণি-ভ্রাতার কথা প্রকাশ্যে এসেছে। এছাড়া কলকাতায় প্রদীপ ঘোষ (নীলু) কংগ্রেসের দাবিতে অনড় থাকবেন। সাংসদ অধীর চৌধুরী সোজা জানিয়ে দিয়েছেন ২০১১-তে মুর্শিদাবাদে তৃণমূলকে কোনও সিট দেওয়া হবে না। একদা মমতা ব্যানার্জি অধীর চৌধুরীকে অ্যান্টি-সোস্যাল বলেছিলেন—সেই জ্বালা অধীরবাবু ভোলেননি।

প্রিয় জায়া দীপা দাশমুন্সি এবং শঙ্কর সিং এক হয়ে নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভাগ দাবি করছেন।

সম্প্রতি গঙ্গা সংস্কার নিয়ে তৃণমূলের প্রশংসা করা হচ্ছে। অথচ এই কাজে এনডিএ সরকারের আমলেই আর্থিক ব্যবস্থা করা হয়েছিল—এ-কথা লজ্জার মাথা খেয়ে সুদীপ ব্যানার্জি কেন ভুললেন? তখন তো তিনি এন ডি এ মন্ত্রিত্বে আসার জন্য অটল-আদবানির কাছে ঘুরঘুর করতেন! এতো একরকমের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা।

এ-রাজ্যের দুই যুযুধান শিবিরের অবস্থা দেখা গেল। দুই শিবিরই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। এঁরা কেউ মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবেন না। শুধু ক্ষমতার চিটেগুড়ের ব্যাপারী হতে চান।

তাই রাজ্যের মানুষের মঙ্গলকামী জনতিতৈষী শক্তিকে গড়ে তুলে তৃতীয় শক্তির অভ্যুত্থান নিশ্চিত করা দরকার।

মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে যাওয়ার সময় হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ০১১-২৩০৯৩১৫৫। এই নম্বরটা চিনতে পারছেন? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম কয়েকমাস পূর্বেই এই নম্বরটা সাংবাদিকদের হাতে তুলে দিয়ে সেটা জনসমক্ষে আনতে চেয়েছিলেন। এটা আদতে একটা ফ্যাক্স নাম্বার। নম্বরটা সাংবাদিকদের দেবার উদ্দেশ্য মাওবাদীরা যাতে এই ফ্যাক্স নম্বরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের 'তৎকালীন' ধারণা ছিল—স্রেফ যোগাযোগের অভাবে মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি প্রক্রিয়ায় বসা যাচ্ছে না। এর স্বপক্ষে আরও একটা নিদারুণ প্রমাণ হলো, নিজের মোবাইল ফোন নম্বর (০৯৭৩৪৬৯৫৭৮৯) পর্যন্ত সাংবাদিকদের দিতে দ্বিধা করেননি চিদাম্বরম। হতে পারে, চিদাম্বরম তথা কেন্দ্রীয় সরকার জনসাধারণকে বার্তা দিতে চাইছিলেন যে নকশাল সমস্যা সমাধানে তাঁরা কতটা আন্তরিক। হতে পারে স্রেফ মাওবাদীদের জন্যই ওই ফ্যাক্স নম্বর বা মোবাইল ফোনটি সাময়িকভাবে চালু করা হয়েছিল। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে কেন্দ্রীয় সরকার মাওবাদীদের সঙ্গে একই টেবিলে একান্তভাবেই আলোচনায় বসতে চাইছিল। তবে একই সাথে তাদের দাবি ছিল যে আলোচনাটা হতে হবে নিঃশর্ত। কিন্তু মাওবাদীরা একের পর এক 'অহেতুক' শর্তারোপ করায় সেই শান্তি-প্রক্রিয়ার শেষ অবধি পঞ্চ ত্বপ্রাপ্তি ঘটেছিল।

দান্তেওয়াড়ার মাও-নৃশংসতার সাম্প্রতিক খণ্ড চিত্র।

সরকারের অগাধ আস্থা ছিল 'গ্রীন হান্ট' অপারেশনের প্রতি। মাওবাদীদের একঘরে করার একটা জুৎসই কৌশল পর্যন্ত রপ্ত করে ফেলেছিলেন চিদাম্বরম। যে কারণে দান্তেওয়াড়ার ঘটনার ঠিক দিন-দুয়েক আগে লালগড়ে প্রথমবার সফরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি জনগণের কমিটিকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আর যাই করুন মাওবাদীদের মুখপত্র হিসেবে কাজ করবেন না। লালগড়ের উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের সেইসঙ্গে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও একগুচ্ছ 'সদুপদেশ' দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তিনি। প্রকারান্তরে বোধহয় তিনি এটাই মেনে নিয়েছিলেন যে অনুন্নয়ন-ই মাওবাদী উত্থানের একটা মস্ত বড় হাতিয়ার। খুব ভুল করেছিলেন চিদাম্বরম। ইনস্টিটিউট অব্ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অজয় সাহানী এবং ওই প্রতিষ্ঠানেরই রিসার্চ ফেলো অজিত কুমার সিং মনে করছেন—অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ক্ষেত্রে মাওবাদীরা একটা বৃহত্তর সংকট সৃষ্টি করেছে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের মনোভাব সেই সংকটকে আরও বৃদ্ধি করেছে।

দান্তেওয়াড়ায় অকস্মাৎ মাও-হত্যালীলায় ৮৫ জন সি আর পি এফ জওয়ানের মৃত্যুর পর দৃশ্যতই হতচকিত চিদাম্বরম মেনে নিয়েছিলেন, 'কোথাও বড় ধরনের একটা গোলমাল কিছু হয়েছে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই একটা খতিয়ান দিয়েছেন—বর্তমানে গোটা কুড়ি রাজ্যে ২২৩টি জেলা মাও-অধ্যুষিত। ২০০৩ সাল নাগাদ এই সংখ্যাটাই ছিল মাত্র ৫৫। মাত্র সাত বছরে মাওবাদীদের এহেন 'উন্নতি'র পাশাপাশি ১৩টি রাজ্যের ৯০টি জেলার প্রায় চারশ' থানা এলাকা মাও-হামলার নীরব প্রত্যক্ষদর্শী। এর মধ্যে এস এ টি পি-র কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পি চিদাম্বরমের এর পরবর্তী পরিসংখ্যানটা আরও মারাত্মক। ২০০৯ সালে সাতটা মাও-অধ্যুষিত রাজ্যে নকশাল-হামলায় মৃতের সংখ্যাটি এরকম—ছত্তিশগড়ে ৩৪৫ জন, ঝাড়খণ্ডে ২১৭ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১৫৯ জন, মহারাষ্ট্রে ৮৭ জন, ওড়িশায় ৮১ জন, বিহারে ৭৮ জন এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ২৮ জন মানুষ মারা গেছেন।

২০০৮-এর মার্চে ঝাড়খণ্ডে সিপিআই (মাওইস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিশির মিশ্রর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ডকুমেন্ট ও সিডি-র তথ্য বলছে ২০০৭-এ মাওবাদীরা ১০০০ কোটি টাকা চাঁদা আদায় করেছিল এবং ২০০৮-এ এই লক্ষমাত্রাটাই পৌঁছে গেছে ১,১২৫ কোটি টাকায়। গত বছরের ২৯ নভেম্বরে ছত্তিশগড় পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল বিশ্বরাজনের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, মাওবাদীরা দেশজুড়ে বার্ষিক ২০০০ কোটি টাকা তোলা তুলেছে। সামগ্রিকভাবে এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে নর-হত্যার পাশাপাশি তাদের আর্থিক শক্তি মজবুত করার দিকে জোর দিয়েছিল মাওবাদীরা। সবচেয়ে বড় কথা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে এনিয়ে যাবতীয় তথ্য মজুত ছিল। তবু তারা তা বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করল না কেন? তা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে।

আসলে কেন্দ্রীয় প্যারামিলিটারী বাহিনীর ওপর অতিরিক্ত ভরসায় সরকারের মধ্যে একটা ভ্রান্ত আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যেমন নকশাল অধ্যুষিত এলাকায় প্যারামিলিটারী বাহিনীর সংখ্যা ৩৭ ব্যাটেলিয়ন থেকে আচমকাই বাড়িয়ে ৫৮ ব্যাটেলিয়ন করা হলো। এই ২১ অতিরিক্ত ব্যাটেলিয়ান মানে প্রায় ৮,৪০০ জওয়ান। সব মিলিয়ে ৬টা নকশাল অধ্যুষিত জেলার জন্য প্রায় ২৩ হাজার কেন্দ্রীয় প্যারামিলিটারী বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, এই ৬টি জেলার আয়তন ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গ কিলোমিটার ও জনসংখ্যা ৪৪ কোটি ৬০ লক্ষের মতো। এদিকে তাঁর বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় কিন্তু প্যারামিলিটারী বাহিনীর জন্য ব্যয়-বরাদ্দ কমিয়েছেন। গত আর্থিক মরসুমে যেটা ছিল ৩০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা, এবার তা কমে ২৯,৯৪০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এমনকী, সেভাবে কোনও ইনক্রিমেন্টও হয়নি জওয়ানদের।

বিশেষজ্ঞরা তাই মনে করছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এটা বোঝা দরকার যে মাওবাদীদের সঙ্গে আর আলাপ-আলোচনায় গিয়ে লাভ নেই। যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন তৈরিই হয়েছে তখন রণাঙ্গনেই মাওবাদীদের মোকাবিলা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর এজন্য দরকার দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা-কে ঢেলে সাজান।

মাও হামলার 'ক্রোনলজি'

জুলাই ১৬, ২০০৮ ঃ ওড়িশার মালকানগিরি জেলায় পুলিশ ভ্যানে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে ২১ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু।

জুন ২৯, '০৮ ঃ ওড়িশার বালিমেলা সংরক্ষিত নদীতে চারজন অ্যান্টি নকশালিট পুলিশ আধিকারিক, ৬০ জন গ্রে হাউন্ড কম্যান্ডো সম্বলিত একটি নৌকায় মাওবাদীরা হামলা চালালে ৩৮ জন মারা যান।

৮ অক্টোবর '০৯ ঃ মহারাষ্ট্রের গাডচিরোলি জেলায় লাহেরি থানা এলাকায় মাও-হামলায় নিহত পুলিশের সংখ্যা ১৭।

৩০ সেপ্টেম্বর '০৯ ঃ ওই জেলাতেই কোরচি ও বেলগাঁও গ্রামের গ্রাম-পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দাহ্যবস্তু রেখে আসে নকশালরা।

২৬ সেপ্টেম্বর '০৯ ঃ ছত্তিশগড়ের জগদলপুরের পায়রাগুডা গ্রামে বিজেপি সাংসদ বলাঘাট বালিরাম কাশ্যপ-এর পুত্রকে খুন করে মাওবাদীরা।

৪ সেপ্টেম্বর '০৯ ঃ ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় চার গ্রামবাসীকে হত্যা করে নকশালরা।

জুলাই ৩১, '০৯ ঃ বিজাপুরে খুন হন বিশেষ পুলিশ আধিকারিক।

জুলাই ২৭, '০৯ ঃ দান্তেওয়াড়ার ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে ৬ পুলিশকর্মীর মৃত্যু।

২৩ জুলাই, '০৯ ঃ গাডচিরোলি জেলায় ৪০ বছর বয়সী এক আদিবাসীকে মারে মাওবাদীরা।

১৮ জুলাই, '০৯ ঃ বস্তারে গ্রামবাসী খুন ও পৃথক ঘটনায় বিজাপুরে রাস্তার কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট গাড়িতে হামলা।

২৩ জুন, '০৯ ঃ বিহারের লাখিসরল জেলার কোর্ট-চত্বরে নকশালদের 'মোটর-সাইকেল' অস্ত্র সহযোগে আক্রমণ এবং রাঁচির কারাগার থেকে তাদের চার সহযোগীকে ছিনতাই।

১৬ জুন, '০৯ ঃ বিহারে দুটি পৃথক ঘটনায় ১১ জন পুলিশ আধিকারিক ও ১০ জন পুলিশকর্মীকে হত্যা করে নকশালরা।

১৩ জুন, '০৯ ঃ বোকারোয় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে ১০ পুলিশকর্মীর মৃত্যুর নেপথ্যে মাওবাদীরা।

১০ জুলাই, '০৯ ঃ ঝাড়খণ্ডের সারান্ডায় মাওহামলায় সি আর পি এফ সহ ৯ পুলিশকর্মীর মৃত্যু।

২২ মে, '০৯ ঃ মহারাষ্ট্রের গাডচিরোলিতে ১৬ জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয় নকশাল আক্রমণে।

২২ এপ্রিল, '০৯ ঃ ঝাড়খণ্ডে ৩০০ মানুষের ট্রেন-হাইজ্যাক ও লেথার জেলা তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবীই ছিল মাওবাদীদের মুক্তিপণ।

১৩ এপ্রিল '০৯ ঃ কোরাপুট জেলায় বস্কাইট মাইন বিস্ফোরণে ১০ জন প্যারামিলিটারী জওয়ানের মৃত্যু।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ ঃ এরাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুরের শিলদা ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের ২৪ জন জওয়ানকে হত্যা করে মাওবাদীরা।

৪ এপ্রিল, ২০১০ ঃ ওড়িষার কোরাপুটে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অ্যান্টি-নকশাল বাহিনীর স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের ১১ জন নিরাপত্তা রক্ষীকে হত্যা করে নকশালরা।

তথ্যসূত্র ঃ পি এন এস

সৌজন্যে ঃ দ্য পাইওনীয়ার

মাওবাদীদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎস-সন্ধানে

- **গ্রামীণ স্ব-রোজগার যোজনা প্রকল্প।**
- **ব্যবসায়িক তোলা আদায়।**
- **গৃহনির্মাণকারী, কয়লা-খনির মালিক, আকরিক লৌহ খনির মালিকদের কাছ থেকে নিয়মিত হারে তোলা আদায়।**
- **সরকারি ভান্ডার ও নিরাপত্তা-রক্ষীদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনতাই।**
- **নেপাল, বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে অস্ত্র-আমদানি।**

জম্মু-কাশ্মীর : স্থায়ী শান্তি স্থাপনে জাতীয় ঐক্যমতকে সম্মান করুন — আর এস এস

গত ২৬ থেকে ২৮ মার্চ কুরুক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ এবং গো-সম্পদ রক্ষা ও গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে গো-গ্রাম যাত্রার সাফল্য সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই দুইটি প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে এখানে প্রকাশ করা হলো। —স্বঃ সঃ।

গত কয়েক বছরে যে দিশায় জম্মু-কাশ্মীরে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে তা নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতিগুলি পুনরায় বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে উস্কে দিচ্ছে।

প্রতিনিধি সভা গণতন্ত্রবিরোধী, তপশিলী বিরোধী, মানবাধিকার বিরোধী, মহিলা বিরোধী এবং জম্মু-কাশ্মীর সরকারের বিচ্ছিন্নতাবাদকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করছে। পরিতাপের বিষয়, রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছন্ন মদতে সেখানকার সরকার বিধানসভার মতো গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলিকে নির্লজ্জভাবে অকেজো করে হিন্দুবিরোধী প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছে। কাশ্মীরী পণ্ডিতরা নিরাপদে তাদের এলাকায় ফিরে বসবাস করার কোনও আশ্বাস পাচ্ছে না এবং তাদের হেনস্থারও কোনও হ্রাস হচ্ছে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা দু'লক্ষ শরণার্থী, ছাম্ব থেকে আসা এক লক্ষ উদ্বাস্তু এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা আট লক্ষ মানুষ এখনও বহু বছর ধরে নির্যাতিত এবং ন্যূনতম মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত।

রাজ্যের তপশিলী হিন্দুরা সুদীর্ঘ আইনী লড়াই লড়ে তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন রাজ্য সরকার তাদের আইনী অধিকারকে পিছনের দরজা দিয়ে বাতিল করতে চাইছে এমনভাবে যে, জম্মু অঞ্চলের তপশিলীভুক্তরা উপত্যকায় কোনও সুযোগ পাবে না— এমন আইন প্রণয়ন করা।

রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ধবংস করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহ দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, যেসব জঙ্গিরা ২০ বছর আগে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে আত্মসমর্পণের নীতি অনুসরণ করে। বলা হচ্ছে যে, অতীতের মৃত নীতিকে পুনর্জীবিত করে স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট (বাতিল) বিল পেশ করে আইনে পরিণত করা। রাজ্যের কোনও মহিলার ভারতের অন্য প্রান্তে কোনও পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হলে রাজ্যে তার নাগরিকত্ব বাতিল করার নীতি কেবল মহিলা অধিকারের বিরোধিতা নয়, তা আন্তর্জাতিক আইনানুগও নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের জম্মু-কাশ্মীরের প্রতি মনোভাব, কার্যকলাপসহ রাজ্যের পরিস্থিতি যেভাবে পরিচালনা করছে, প্রতিনিধি সভা তার সর্বতোভাবে নিন্দা করছে। তারা গৃহীত নীতির মাধ্যমে যুগপৎ রাজ্যের ও বাইরের সন্ত্রাসবাদকে সাহায্য করছে। প্রধানমন্ত্রীর কাশ্মীর সংক্রান্ত কার্যকরী গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান বিচারপতি সাগির আহমেদের রিপোর্টে ৩৭০ নং ধারার স্থায়ীকরণের কথা, রাজ্য বিধানসভার মাধ্যমে রাজ্যপাল নির্বাচিত করা এবং রাজ্যকে আরও স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশের কথা বলা হয়েছে, যা শুধু বিচ্ছিন্নতাবাদকেই সহায়তা করছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, রাজ্যের সমস্যা স্পষ্টত রাজনৈতিক সমস্যা এবং তার সমাধান রাজনৈতিকভাবে করতে হবে—এমন বিবৃতি স্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দোদুল্যমান মনোভাবকেই স্বীকৃতি দেয়। প্রতিনিধিসভা মনে করে, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সমস্যা হলো সীমান্তের ওপার থেকে পরিচালিত পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ। কড়া হাতে এর মোকাবিলা করতেই হবে। দুর্ভাগ্য যে, এই ইস্যুকে সরকার 'কোয়াইট ডিপ্লোমেসি' আখ্যা দিতে চাইছে। প্রতিনিধি সভা সরকারকে এই বিষয়ে স্বচ্ছ নীতি গ্রহণ করতে অনুরোধ করছে।

প্রতিনিধি সভা মনে করে যে, সরকারের এহেন দোলাচল মনোবৃত্তি সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সাগরেদদের সাহায্য করছে। হুরিয়ত এবং অন্যান্য ভারতবিরোধীদের ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে দিল্লি এসে পাকিস্তানী বিদেশ সচিবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, দিল্লিস্থ পাক দূতাবাসের পার্টিতে তাদের যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমনকী এদের বিদেশে 'ও আই সি' সভায় যোগদানের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধি সভা সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখছে, কি কারণে সরকার এমন দেশশত্রুদের সাহায্য নির্লজ্জভাবে করল?

এমন নির্লিপ্ততা গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার উপত্যকায় হিংসাত্মক কাজকর্ম ঘটাতে সাহায্য করেছে। সামরিক বাহিনী স্বীকার করেছে সীমান্ত দিয়ে বহু অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী সরকারের কাছে তুলে ধরেছে, নতুন নতুন পাক মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা যা 'বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদ' নামে আখ্যাত। গত কয়েকমাসে ধর্না, মিছিলের ঘটনা ঘটেছে, যাতে ১৫০০ সি আর পি এফ জওয়ান আহত হয়েছে এবং তাদের গাড়িতে হামলা হয়েছে ৪০০ বার।

প্রতিনিধিসভা উদ্বিগ্ন এই জন্য যে, এইসব ঘটনা উপত্যকায় বাহিনীর মনোবলে আঘাত হানবে। সাড়ে তিন হাজার সেনাকে সরিয়ে নেবার ঘটনাও ইতিমধ্যে তাদের নৈতিক শক্তির ওপর আঘাত হেনেছে। বাহিনীর ওপর সোপিয়ান ধর্ষণের ঘটনার দায় চাপিয়ে, শ্রীনগরে গুলি চালাবার মতো ঘটনাও তাদের নৈতিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

এমনসব ঘটনাবলী এমন এক ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, একজন বি এস এফ আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং রাজ্য পুলিশের হাতে সঁপে দিয়ে বলা হয়েছে, তাঁরই নির্দেশে তাঁর জওয়ানরা কেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হল তা তদন্ত করতে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সরকারের কাছে দাবি পেশ করছে যে, সরকার ভারত-পাক সম্পর্ক সুসঙ্গত এবং সুস্পষ্ট করুক। পাকিস্তান তার ঔদ্ধত্যকে বৃদ্ধি করে গিলগিট-বালটিস্থানকে নিজেদের দেশের পঞ্চম প্রদেশ বলে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত সরকারের উচিত এর বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানানো। কারণ ওই অঞ্চল পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অঙ্গ এবং তা আমাদের অঞ্চল। প্রতিনিধিসভা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সালে সংসদে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করে বলা হয়েছিল যে, সরকার পাকিস্তানের কাছে দাবি জানাবে যে, সমগ্র পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ভারতকে প্রত্যর্পণ করা হোক।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সরকারের কাছে আবেদন করছে যে, সরকার জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্যমত্য ঘোষণা করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা মেনে চলুক। এক্ষেত্রে সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখবে—

জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এ নিয়ে কোনও আলোচনাই চলতে পারে না।

রাজ্যের জন্য পৃথক সংবিধান এবং পৃথক পতাকা দেশের সংহতির পরিপন্থী। এই তত্ত্ব দেশের সংবিধানের মৌলিক ধারার পরিপন্থী, গণতন্ত্র এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে। সুতরাং তা ধবংস হোক।

৩৭০ ধারা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কেবলমাত্র অস্থায়ী অনুচ্ছেদ হিসেবে। এই ধারা রদের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা একে নিজেদের প্রয়োজনে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

আত্মসমর্পণ নীতি, উন্মুক্ত সীমান্ত, সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (এ এফ এস পি এ) ইত্যাদির প্রশ্নে আমাদের সতর্ক হতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তানের ফ্রন্টে কী ঘটনা ঘটছে তার প্রতি এবং আমাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কী।

সুরক্ষা বাহিনীর অপসারণ এবং আমাদের নিরাপত্তা কর্মীদের মনোবলের অবদমন আমাদের ঘরে ও বাইরের নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটাবে।

প্রতিনিধিসভা সরকারকে সতর্ক করে দিচ্ছে এই বলে যে, সরকারের উদাসীনতা এবং জম্মু-কাশ্মীরের ইস্যুতে সমঝোতা জাতি বরদাস্ত করবে না।

প্রতিনিধি সভা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে যে, বিতাড়িত মানুষদের নাগরিক অধিকার সরকার শীঘ্রই ফিরিয়ে দিক। সভা আরও দাবি করছে যে, জম্মু-লাদাখ অঞ্চলের পরিস্থিতির ওপর সঠিক নজর রেখে জম্মু-লাদাখ অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করে সেখানকার সাধারণ মানুষের দুর্দশা সরকার অবিলম্বে দূর করুক। রাজ্যের যে কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভব যদি জম্মু-লাদাখের সাধারণ মানুষ এবং বিতাড়িত হিন্দুসহ পণ্ডিতদের এই সমস্যার সমাধানে সামিল করা।

প্রতিনিধি সভা স্বয়ংসেবকদের আহ্বান জানাচ্ছে যে, তারা জম্মু-কাশ্মীরের গণতন্ত্রের যে অবমাননা চলছে এবং সেখানকার জাতীয়তাবাদী মানুষদের অসহনীয় দুর্দশা চলছে সেই সম্পর্কে সমস্ত দেশবাসীকে সচেতন করুক যাতে সমস্ত জাতি তাদের দুর্দশা মোচনে, তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে।

বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন

গো-সম্পদ রক্ষার্থে সার্থক প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রাকে সফল করার জন্য সারাদেশের পূজ্য সাধু-সন্তদের প্রতি এবং যে সকল দেশবাসী, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এজন্য সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। উন্নয়নের বর্তমান ধ্যানধারণার জন্য যে ক্ষতি হচ্ছে তার ফলে সারা পৃথিবীতেই পরিবেশের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিয়েছে। এরকম সময়ে প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল এবং গো-আধারিত গ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়নের বৈকল্পিক যোজনা কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তাকে এই যাত্রা তুলে ধরতে পেরেছে।

গত বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে এবছরের ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার মূল যাত্রা এবং বিভিন্ন উপযাত্রা সব মিলিয়ে যাত্রাপথে সারাদেশের ৪ লক্ষ ১১ হাজার গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে। ২ লক্ষ ৩৪ হাজার স্থানে বিভিন্ন ছোট-বড় জনসভায় দেড় কোটির বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। গোরক্ষার জন্য আবেদনপত্রে প্রায় সাড়ে আট কোটি ভারতবাসী স্বাক্ষর প্রদান করেছেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সাংসদ, বিধায়ক এবং বিভিন্ন মত-পন্থ-সম্প্রদায়ের মানুষেরা রয়েছেন। প্রতিনিধি সভার মতে, এই বিশালসংখ্যক মানুষের গোরক্ষার্থে স্বাক্ষরদানই প্রমাণ করছে দেশে গোরক্ষার পক্ষে কীরকম ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে। এটাই বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে গোরক্ষা এবং গো-কেন্দ্রিক গ্রাম বিকাশের ব্যাপক কার্য-যোজনাকে কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

রাসায়নিক সার প্রয়োগে কৃষির অলাভজনক হওয়া এবং স্বাস্থ্যের উপর কুপ্রভাব, জমির বন্ধ্যাত্ব, গ্রামে শিক্ষা-চিকিৎসার মতো জীবনযাপনের মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, সেচের জন্য জলের অভাব প্রভৃতি কারণে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার প্রবণতা বাড়ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারের দিক থেকে গ্রামের উন্নতিকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়ার দরকার ছিল। গ্রামেই উচ্চগুণাত্মক শিক্ষা ছড্রন্দ্বড় ত্বত্ত্বপ্তন্দ্ধন্ত ড্রস্তুত্বত্ত্বদ্ধন্স্পঙ্গ, চিকিৎসা, পরিবহন প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধার বিস্তার, কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে গ্রামেই আয় বাড়ানোর সুযোগ বৃদ্ধি করা দরকার। ভারসাম্য যুক্ত কৃষি-ফসল চক্র, জৈবিক-প্রাকৃতিক ও পরিবেশের পরিপূরক কৃষি, পরম্পরাগত জলের উৎস সমূহের সংস্কারসাধন, নতুন নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও উন্নয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বাবলম্বী গ্রাম নির্মাণ সম্ভব। সেক্ষেত্রে আর্থিক সংকট থেকে পরিত্রাণ এবং পরিবেশ দূষণ বা পর্যাবরণ সংকট থেকেও রক্ষা হতে পারে। এজন্য গ্রামের ভূ-সম্পদ, জল সম্পদ, বন সম্পদ, গো-সম্পদ এবং অন্যান্য জৈবিক সম্পদের সুরক্ষা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতির জন্য সত্বর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এছাড়া খাদ্যে সতত স্বনির্ভর হওয়ার জন্য কৃষিজমির

(এরপর ১৩ পাতায়)

একান্ত সাক্ষাৎকার : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুত্ব যাঁর কাছে 'ওয়ে অব্ লাইফ'

তিনি সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। যাঁর জীবনের শেষ তপস্যা একটি বিচিত্র লেখনী 'স্বামী বিবেকানন্দ ঃ এক অনন্ত জীবনের জীবনী।' আর এই তপস্যার 'তন্ত্রধারক' স্বস্তিকার প্রয়াত সম্পাদক ভবেন্দু ভট্টাচার্য। এমনই অনেক অজানা কথার একান্ত আলাপচারিতায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি স্বস্তিকার প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

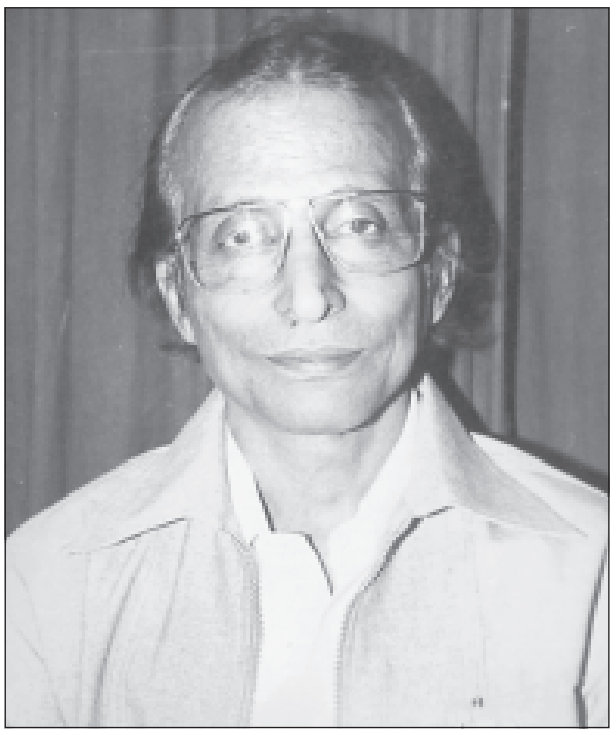

❑ আপনার সাহিত্যজীবনের উষালগ্নের কথাটা প্রথমেই জানতে চাইব।

● আমি পড়তাম স্কটিশ চার্চ কলেজে। সেসময় একটা ব্যাপার খুব চালু ছিল। প্রায় সকলেরই মনে হোত হয় কবি হব, না হয় লেখক হব। কিংবা গীতিকার হব, সুরকার হব, গায়ক হব। আরেকটু রিমোট অনেকে বলত দানীবাবুর মতো অভিনেতা হব, গিরীশবাবুর মতো গ্যারিক হব। পড়ছি অবশ্য অন্য বিষয়। কিন্তু ভাবধারাটা ছিল এরকমই 'ক্রিয়েটিভ সাইডে' যাবার। এটাই বোধহয় বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আসলে সেই সময়কার ছেলেদের নষ্ট করার মতো বিজ্ঞাপন আসেনি, এখন তো ব্যবসায়ীরা মানুষকেও পণ্য করে ফেলেছে। তখন কিন্তু সুস্থ চিন্তা-ভাবনাটা ভীষণভাবে ঘোরাঘুরি করত। এছাড়া দেশ তখন সদ্য স্বাধীন। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা প্রভাবও ছিল। যাই হোক, আমাদের মধ্যে অনেকেই একটু আধটু লিখত। আমরা একজায়গার হেঁদোর ঘাসের ওপর বসে থাকতাম। সবে বিকেল হচ্ছে। একদল ছেলে পাগলের মতো জলে ডাইভ দিচ্ছে। ঝপাং ঝপাং একটা শব্দ উঠে আসছে। এদের লক্ষ্য বড় সাঁতারু হওয়া। তখন জিমন্যাসিয়াম ছিল হেঁদোতে। সেখানে রাতের বেলা ডাম্বেল ভাঁজার অদ্ভুত ধরনের ধাতব শব্দ শোনা যেত। এছাড়া ছিল গোবরবাবুর (গুহ) কুস্তির আখড়া। সেখানে আমরাও মাঝে-মধ্যে যেতাম। যাই হোক, তখন অল্প অল্প লেখা হোত, সেই ঘাসের ওপর বসে কেউ একজন পড়ল;তারপর তার সমালোচনা হতে থাকল। সেই সময় খাদ্যবস্তুর মধ্যে চিঁড়ে-বাদাম আছে, চাঁদা করে কেনা হয়েছে;একটু ঝাল-নুন আছে। তখন স্কটিশ চার্চে যে কাগজ ছিল, সেটা যিনি সম্পাদনা করতেন, তার নাম এখনও মনে আছে;তিনি দেবুদা। তিনি কলেজের সেই কাগজের জন্য আমায় একটা গল্প লিখতে বললেন। তো কি লেখা যায়? গতানুগতিক লিখলে লোকে বলবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্করকে নকল করেছে। সুতরাং এমন কিছু লিখতে হবে যার মধ্যে একটা নতুনত্ব রয়েছে। তো ইংরেজি সাহিত্যের দিকে আমার গতিবিধিটা ছিল বেশি। ওদের কন্টিনেন্টাল সাহিত্য যেমন কাম্যু, কাফকা, বিশেষ করে জেমস অরওয়েলের সাংবাদিকতাধর্মী লেখা, 'দ্য বার্মিজ ডেজ' আমার খুব প্রিয় ছিল। এঁদের ওপর ভরসা করেই যে গল্পটা লিখলাম তার নাম 'গভীর রাতের ভাবনা'। এর বিষয়বস্তুটা খুব সাংঘাতিক। একটা নির্জন ভুতুড়ে বাড়ি। তার বিশাল বড় হলঘরে ওককাঠের টেবিলে এক মধ্যবয়সী লোক মাথা নীচু করে বসে আছে। তার চুলগুলো সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। তিনি আলোর দিকে ছবির এক একটা নেগেটিভকে তুলে তুলে ধরে দেখছেন। তারপর কি হলো! পকেট থেকে একটা লাইটার বেরল। খচ্ খচ্ শব্দ হলো। একটা ফ্লেম, তারপর একটা ফ্ল্যাশ মারল। এরপর জ্বলে গেল। দেখা গেল ওই ছবির চরিত্রগুলো উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে সেলুলয়েডের গা থেকে বেরিয়ে এল। ঘরটা একেবারে মানুষ-জনে ভরে গেল। টি এস ইলিয়টের এমনই একটা কবিতা আছে। যাই হোক, এই চরিত্রগুলোর সঙ্গে সারারাত ধরে একের পর এক এনকাউন্টার হলো। এরপর একসময়ে অকস্মাৎ এই গল্পের লেখক আবিষ্কার করলেন যে ভোর হয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই। সে দৌড়ে গেল। যদি ছাই-টাই কিছু থাকে! কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল, সিগারেট পুড়ে গেলে তার ইনট্যাক্ট ফর্মে যে ছাইটা থাকে, সেরকম পড়ে রয়েছে। এই গল্পটা পড়ে দেবুদা মহাখুশী। বলল, 'চ্। বসন্ত কেবিনে তোকে ভেজিটেবিল চপ খাইয়ে আনি।' কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে সাত-আটদিন পরে খবর পেলাম দেবুদার টাইফয়েড হয়েছে। দেবুদাকে যখন দেখতে গেলাম তখন আমার হাত ধরে সে বলল, 'সঞ্জীব, আমি বুঝি আর বাঁচব না।' আমি বললাম, 'যাঃ। কি বলছিস তুই'। সে বার বার আমার গল্পটার কথাই বলতে লাগল, বলল 'ইউনিয়ন অফিসের ফাইলে ওটা রয়েছে।' সত্যিই দেবুদা আর বাঁচল না। মনটা এমন খারাপ হলো যে মনে হলো, কিসের জন্য গল্প? কার গল্প! এই গল্পটার কথা আজ এতদিন পর তোমাকে বললাম কারণ ওই গল্প আমি আর লিখতে পারব না। এরপর স্কটিশ থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লাম রসায়নের জগতে। আমার মা-তো ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন। আমার বাবা যার পরিচয় তোমরা 'লোটাকম্বলের' হরিশঙ্করে পেয়েছ তিনি ছিলেন ভয়ংকর আদর্শবাদী মানুষ। তবে তিনি ছিলেন একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, অন্যদিকে গণিতজ্ঞ, সেইসাথে রসায়নেও পারদর্শী ছিলেন। বৃটিশদের সাথে পাল্লা দিয়ে 'কেমিক্যাল' জিনিসপত্র তৈরি করেছেন তিনি। আমার তাই মনে হয় যারা অঙ্কটা ভাল জানেন, তারা ভাল শিল্পীও হন। যাই হোক, বাবার অনুশাসনবদ্ধ জীবনে ঢুকে মনে হলো লেখাটা কখনও মূল জীবন হতে পারে না। ওটা বড়জোর জীবনের বাই-প্রোডাক্ট মাত্র। কিন্তু আমি লেখার জগত থেকে তখন দূরে সরে গেলেও কাগজ ছাড়াই একটা লেখার ব্যাপার ছিল। যেমন, আমি খুব দেখতে ভালবাসতাম। হঠাৎ দেখলাম, গঙ্গায় বান আসছে, আধঘণ্টার মধ্যে গঙ্গা ভরপুর হয়ে গেল। বাগবাজারের ঘাটে যত নৌকা বাঁধা ছিল সব শান্তিপুর, নবদ্বীপের দিকে রওনা দিল। এরপর সাঁতার কাটার সময় বৃষ্টি এল, ঘুসুড়ি আর বালির দিক ঝাপসা হয়ে গিয়ে গঙ্গাটাই যেন ছোট হয়ে গেল। সেখানে স্নান করার সময় বৃষ্টি পড়ার টাপুর-টুপুর শব্দ সন্তুরের মতো অসাধারণভাবে আমার কানের কাছে বাজত। কখনও কানের পাশ দিয়ে শুশুক উঠে পড়ত। একবার তো হাতে সাপ জড়াল। আরেকবার কঙ্কালের রিবে আমার পা ঢুকে গেল। সে এক বীভৎস 'অভিজ্ঞতা'। লেখা বন্ধ থাকলেও লেখাপড়াটা চলছিলই। সেই সময় স্টেটসম্যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের জন্য বেশ কিছু বই সস্তায় বের করেছিল। এর মধ্যে ছিল পৃথিবীর সব বড় বড় চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা (ফিলজফি) সম্বলিত একটা বই। সেই বইটা পুরো পড়ে ফেলে আমি একটা প্রবন্ধ লিখলাম। নাম দিলাম 'মানুষ'। পাঠিয়ে দিলাম উদ্বোধন পত্রিকায়, তৎকালীন সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আমাকে পোস্টকার্ড দিয়ে ডাকলেন উদ্বোধনের কার্যালয়ে। তিনিই আমার সাহিত্য জীবনের গুরু। আমার জীবনটাকে গঠন করে দিয়ে চলে গেলেন আমেরিকায়। এরপর উদ্বোধনে লেখা শুরু করলাম, 'পরমপদকমলে'। বহু পরে স্বামী অজ্ঞজানন্দের সময় 'মানুষ' প্রবন্ধটাও বেরিয়েছিল ওই পত্রিকায়। সরকারের শিল্পদপ্তরে চাকরি করেছি বেশ কিছুদিন। মন্ত্রীদের বক্তৃতাও লিখতাম তখন। এরপর এল নকশাল আমল। নিজের চোখে দেখা 'গ্রেট বরানগর কিলিং' নিয়ে একটা গল্প লিখে

দু'জনে মুখোমুখি

গভীর সুখে - সুখী হ্ল ভবেন্দুদার সংবর্ধনা সভায়

যুগান্তরের তুষারকান্তি ঘোষের খুব বন্ধু মানুষ ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'অমৃত' পত্রিকায় দিলাম। তিনি অমৃত-এ ওই গল্পটা ছাপালেন। এরপর ওনারই রেফারেন্সে দেশ পত্রিকায় বিমল করের কাছে একটা গল্প নিয়ে গেলাম। বিমলদা'র জগতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি চাকরির সুবাদে 'জীবিকার সন্ধানে' বলে একটা কলাম লিখতে লাগলাম। এরপর দেশ পত্রিকায় গল্প লিখলাম। এর মধ্যে শ্বেতপাথরের টেবিল খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। গজেন্দ্র মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, গৌরি আয়ুব, আবু সৈয়দ আয়ুব এঁরা সকলেই আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে দেশ পত্রিকায় চিঠি দিলেন। ওই বছরই উপন্যাস বেরোলো 'পায়রা'। সেটাও খুব ভালভাবেই গৃহীত হলো। ইতিমধ্যে আমার অনেকদিনের শখ ছিল সাংবাদিক হব। আনন্দবাজারের অভীকবাবুর প্রস্তাব এল ওঁদের কাগজে চাকরি করার। আমি সরকারি চাকরিটা ছাড়া উচিত হবে কিনা এনিয়ে দোনামনা করলেও বাবার উৎসাহে শেষ অবধি আনন্দবাজারে চাকরি নিলাম।

❑ আপনার সাহিত্যজীবনের উষালগ্ন থেকে মধ্যগগনে যেতে যেতে মনে এল 'স্বস্তিকা'র একদা সম্পাদক প্রয়াত ভবেন্দু ভট্টাচার্যের কথা। তাঁর সাথে আপনার একটা আলাদা সম্পর্কের কথা সুবিদিত। সেই বিষয়টাই আরেকবার জানতে চাইব।

● ঠিকই। তখন স্কটিশে পড়ি। একটা কিছু লিখে ফেললাম, লিখে কারুকে কিছু বললাম না। কি করা যেতে পারে! নিজে নিজেই আবিষ্কার করলাম 'স্বস্তিকা' বলে একটা সংবাদপত্রের অস্তিত্ব। ওই যে বাঁদিকে ফুটপাথের ওপর আর্য সমাজের বাড়িটা, তার পাশে বিশাল দরজা, ভেতরে ডাকছে যেন! আমার এখনও মনে আছে, বিকেলবেলায় গুটিগুটি পায়ে গিয়ে ঢুকলাম। তখন যুবক ভবেন্দুবাবু বসে আছেন। তবে এনকাউন্টারটা খুব সুবিধের হলো না। লেখা দেবার পর উনি বললেন, 'কি করা হয়?' জানালাম ছাত্র, স্কটিশে পড়ি। উনি বললেন, লেখাটা বড় গুরুতর হয়েছে! বললাম, ভারি জিনিসই ভেবেছি। উনি আবার বললেন, এটা তো সাধারণ সংখ্যায় যাবে না। পুজো সংখ্যায় দেওয়া যায় কিনা দেখছি। যদিও সে লেখা ছাপা হয়নি। কিন্তু তাঁর সাথে সম্পর্ক সারা জীবনই অটুট থেকেছে। তাঁকে আমার স্ত্রী 'বাবা' বলতেন। কারণ তখন সদ্য আমার শ্বশুরমশাই মারা গেছেন এবং ভবেন্দুবাবু এ বাড়িতে এসে দোতলায় পুজো ও হোম করছেন। তিনি প্রত্যেকবছর পুজোর আগে একবার করে আমার বাড়িতে আসতেনই আসতেন। আমরাও যেতাম মাঝেমধ্যে স্বস্তিকায়। তবে পত্রিকা ছাড়াও ওনার সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম কারণ ছিল উনি তন্ত্রসাধক, আমরাও তন্ত্রসাধনার বংশ। আমার স্ত্রীকে তিনি পুজো ও জপ-তপের ব্যাপারেও নির্দেশ দিতেন। সে তো ভবেন্দুবাবুকে পিতৃপদে বরণ করেছিল।

❑ তাঁর সাথে অন্তিম সাক্ষাৎকারটা কবে হয়েছিল মনে আছে?

● বেশ মনে আছে। তাঁর মৃত্যুর সাত-আটদিন আগে হবে। সেদিন তখন বেশ রাত, আমি আনন্দবাজার থেকে ফেরার পথে ওখানে গেলাম, দোতলায় উঠে দেখলাম ভবেন্দুদা বসে আছেন। তাঁর সাথে দু'তিনজন সহকর্মী রয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিজয়কে (আঢ্য) আমার বেশ মনে আছে। ভবেন্দুদা আমাকে পেয়ে উৎফুল্ল। বললেন, 'তোমায় ছাড়ব না সঞ্জীব। সিঙ্গাড়া তোমায় খেতেই হবে।' আমি বললাম—এত রাত ভবেন্দুদা! এখন সিঙ্গাড়া খেলে তো অম্বল-টম্বল হয়ে মরেই যাব আমি। উনি নাছোড়বান্দা। শেষে চা-টা, সিঙ্গাড়া-টিঙ্গাড়া খাওয়া হলো। উনি বললেন, তুমি আবার একটা ধারাবাহিক শুরু কর। আমি তো ওখানে কিছুকাল লিখেও ছিলাম। নীচ অবধি আমাকে খালি পায়ে এগিয়ে দিতে এলেন। তারপরেই দিন আটেক বাদে সেই মর্মান্তিক খবরটা এল যে উনি আর নেই। আসলে উনি নিজের জীবনটাকে খুব চেপে রাখতেন, ওনার পূর্বাশ্রমের খবরাখবর সব জানতে পারা যেত না।

❑ ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক বর্তমানে আপনি 'স্বামী বিবেকানন্দ ঃ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' লিখে চলেছেন। এমন একটা বৃহত্তর ক্যানভাসে আপনি স্বামীজির জীবনটাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন তা কি উপন্যাস, কি রচনা, কি প্রবন্ধ; সাহিত্যের কোনও গন্ডীতেই বোধহয় একে আবদ্ধ করা যাবে না। ঐতিহাসিক সাহিত্যের খতিয়ানেও এর জুড়ি মেলা ভার। জানতে ইচ্ছে করে, এই অনন্যসাধারণ সৃষ্টির পেছনের অনুপ্রেরণাটা কার?

● ভবেন্দুদা আমাকে বারবার বলতেন, সঞ্জীব তুমি এমন কিছু লেখ, যেটা লিখে তুমি আনন্দ পাবে। এই বলে, তিনি আমাকে একটা সাবজেক্টও দিলেন। বললেন, ধর তুমি একটা নিরীহ বালক। তুমি স্বামীজীর সময় কলকাতায় আছ। সেই সময়কার সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছ। তখনও আমি এই লেখার কথা ভাবতেই পারিনি। কারণ ঠাকুর-মা এঁদের নিয়ে লেখা অনেক সহজ। কিন্তু স্বামীজী হলেন জ্ঞান। ব্রহ্মজ্যোতি। ওঁর ধারে-কাছে যেতে আমি ভয়ই পেতাম। যাই হোক, আমি ভবেন্দুদার কথায় হ্যাঁ হ্যাঁ বললাম বটে কিন্তু মনে সাহস পাচ্ছিলাম না। পরে বরুণবাবুর (সেনগুপ্ত) উৎসাহে এ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করি। বরুণবাবু আজ আর নেই, কিন্তু লেখাটা চলছেই চার বছর ধরে। আসলে আমি তো ভবেন্দুদাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতাম। আমার এখনও মনে আছে—যে মাদুরে তিনি বসতেন, যে আসনে বসে তিনি আমার ঠাকুরঘরে পুজো করতেন সেই সবকিছু। তাঁর বলা আর বরুণবাবুর উৎসাহ—এই দু'টোকেই সম্বল করে সব শারীরিক কষ্ট ভুলে আমি এখন এই লেখাটা নিয়েই বেঁচে আছি। এটাই আমার জীবনের শেষ তপস্যা।

❑ আপনার কাছে হিন্দুত্বের সংজ্ঞাটা ঠিক কি?

● হিন্দুত্ব বলতে আমি বুঝি 'ওয়ে অব্ লাইফ'। স্বামীজী একটা জায়গায় বলছেন, যে ধর্ম সমাজে কিছু উচ্চ ভাবনা সম্পন্ন উচ্চস্তরের মানুষ তৈরি করতে পারে না সেটা ধর্ম নয়। ধর্মের কাজ হলো সভ্যতা তৈরি করা।

❑ আপনি আমেরিকায় গিয়ে একবার বলেছিলেন যে রামকৃষ্ণ কথামৃত হলো জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ধর্ম আর আধ্যাত্মিক-সাহিত্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন?

● দেখ, ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতা ব্যাপারটাকে আগে ভাল করে বুঝতে হবে। ইসলামে আল্লা, খৃষ্টানে খ্রাইষ্ট, শাক্তে কালী, বৈষ্ণবে রাধাকৃষ্ণ, তিববতীরা গডলেস, জৈন-এ তপস্যা। এগুলো হলো রিলিজিয়ন বা ধর্ম। এবার একটু অস্বস্তি হবে যখন আমরা বলব হিন্দু ধর্ম। দেখ প্রত্যেকটা ধর্মের একজন ধর্মগুরু আছেন। তাদের নীতি আছে, শাস্ত্র আছে। কোরান, বাইবেল

(এরপর ১৫ পাতায়)

চিঠিপত্র

স্টিফেন কোর্টে অগ্নিকাণ্ড

গত ২৩ মার্চ ২০১০ তারিখে স্টিফেন কোর্টের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯-এ। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এখনও সব দেহ শনাক্ত হয়নি। মৃত্যু মিছিল ক্রমশ দীর্ঘ। সারা রাত ধরে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলেছে। ডি এন এ পরীক্ষার জন্য ১৭ জন রক্ত দিলেন। আগুন সামাল দিতে রাজ্য সরকারের দমকল মন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। সময়মত ত্রস্তসন্ত্রস্তনন্দদ্ধ, ত্বন্দ্বদ্ধ প্রভৃতি এলে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচতো।

দমকলমন্ত্রী দপ্তরের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করলেন, অথচ পদত্যাগ করতে নারাজ নির্লজ্জ ও বেহায়া দমকলমন্ত্রী। ইতিপূর্বে নন্দরাম মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে। এরা মানুষ না পশু? এখনও দোরে দোরে ঘুরছে নিখোঁজদের স্বজনরা। এস. এস. কে. এম হাসপাতালের মর্গে নিখোঁজ মানুষের আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা জানতে একবারের জন্যও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেউ না আসায় স্বভাবতই তারা ক্ষুব্ধ ও হতাশ। মর্গে আসা মানুষের সঙ্গে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা পুরসভার উপর দোষ চাপিয়ে অব্যাহতি পেতে চাইছেন। তিনি বিধানসভায় বলেছেন যে প্রশাসনের একটি অংশের সঙ্গে বেআইনী নির্মাণ চক্রের ভাল যোগসাজশ আছে। অপর দিকে মেয়র বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী সঠিক জানেন না যে ওই বাড়ীর বেআইনী অংশ টাকা নিয়ে বৈধ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও মেয়রের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী সাত বছর রাজ্যের পুরমন্ত্রী ছিলেন। কেন তিনি কলকাতা পুর আইনে বেআইনী বাড়ীকে আইনী করার বিতর্কিত ধারাটি বাতিল করেননি?

এত বড় অঘটনের পরে ভবিষ্যতের জন্য তৎপর হয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনা রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। অতীত অভিজ্ঞতা প্রশাসনের এই তৎপরতার প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না। সংশয় থেকে যাচ্ছে। কাজ হবে কী! যাবতীয় পরিকল্পনা কাগজে কলমে থেকে যাবে না তো? কমিটি না কমিশন বসানো হবে—এটা নিয়েও বিরোধ ও বিতর্ক। ধামা চাপা দেবার সুন্দর ব্যবস্থা! সুতরাং অবিলম্বে এই অপদার্থ ও জনস্বার্থ বিরোধী রাজ্য সরকারের অপসারণের জন্য রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ করা উচিত বলে মনে করি।

—অধ্যাপক আশিষ রায়, বি. গার্ডেন, হাওড়া-৩।

প্রাথমিকেও জ্যোতি বসু

স্বস্তিকায় ৩০ ফাল্গুন (১৫.৩.১০) সংখ্যায় বিদ্যাধর ভট্টাচার্যের স্কুল পরিচালনায় রাজনৈতিক দলাদলি সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও যথার্থ। শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজনীতির নোংরা খেলায় রাজ্যের শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটে চলেছে। স্কুলের শিক্ষার আঙিনায় এই রাজনীতির অনুপ্রবেশের প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের ওপর পড়তে বাধ্য। ফলে পরোক্ষে ছাত্রছাত্রীরাও রাজনীতির মায়াজালে আবদ্ধ হতে থাকে। শুধুমাত্র উচ্চস্তরের স্কুলেই নয়, প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলিকেও রাজনীতির ছত্রছায়ায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্প্রতি হুগলী জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটি সংক্রান্ত ও নির্দেশাবলী সম্বলিত ক্যালেণ্ডারে জ্যোতি বসুর ছবি ছাপানো হয়েছে। এই নির্দেশিকা ক্যালেণ্ডার চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রতিটি বিদ্যালয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন বিভিন্ন মহাপুরুষের ছবিই একমাত্র ওই ক্যালেন্ডারে প্রকাশিত হোত। কিন্তু জ্যোতি বসু কোন মহাপুরুষের সঙ্গে তুলনীয়? দীর্ঘদিন বাম অপশাসনের খলনায়ক ও বাম আন্দোলনের 'মহান' নেতার ছবি সরকারী প্রতিষ্ঠানে কতটা শোভা পায়? এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না তো? শৈশবকালেই শিশুর নিষ্কলঙ্ক মনের অন্তরে যদি রাজনীতির কলঙ্ক প্রবেশ করে তাহলে শিক্ষায় তার মন বিকশিত হবে কি? এহেন ঘটনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভবিতব্য কি তা সহজেই অনুমেয়। সর্বশিক্ষা মিশনের দৌলতে প্রায় প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নূতন ভবন নির্মিত হয়েছে। অনেক ভবনেই মহাপুরুষদের ছবি ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বাণী লেখা হয়ে থাকে। এরপর কি তাহলে জ্যোতি বসুর কোনও বাণীও বিদ্যালয় ভবনগুলিতে ঠাঁই পাবে। আসলে বাম জমানায় শিক্ষায় রাজনীতির প্রবেশ সর্বজনবিদিত। শিক্ষার মানোন্নয়ন এরাজ্যে যেন গৌণ ব্যাপার। এমনিতেই স্কুলে মিড্ ডে মিল চালু, পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া ও গ্রেডেশন প্রথার প্রচলন ইত্যাদির জন্য প্রকৃত শিক্ষার গুণগতমান নিম্নগামী। সেই ধারাকে ত্বরান্বিত করার জন্যই কি বামসরকার সচেষ্ট? এ জন্যই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের পথে বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাই এ রাজ্যের স্কুলগুলোতে মোটামুটি পরিকাঠামো থাকলেও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে রাজ্যে শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতা যে বৃদ্ধি পাবে না তা বলা যায়।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলি।

বাংলাদেশে চাকমারা

এক সময়ের পূর্ব-পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম চাকমাদের একচেটিয়া বাস ও স্বশাসিত অঞ্চলরূপে শাসিত হত। পাকিস্তান সরকার সেখানে চাকমাদের জনসংখ্যা ও স্বশাসন খর্ব করার জন্য পরিকল্পিতভাবে স্বদেশের মুসলমানদের পুনর্বাসন দিতে শুরু করল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রইল। একসময় সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও সরকারি মদতে চাকমাদের উৎখাত করতে শুরু করল এবং প্রাণ রক্ষার্থে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। এটা সকলেরই জানা যে, এখনও হয়ত সমস্ত চাকমা শরণার্থী স্ব-ভূমিতে (পুরুষানুক্রমে বাস করা মাতৃভূমিতে) ফিরে যেতে পারেননি।

কাশ্মীর ভারতের একটি রাজ্য। এই সেদিনও সেখানে বিপুল সংখ্যক হিন্দু পুরুষানুক্রমে বসবাস করত। কিন্তু ইসলামের নীতি রূপায়ণে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা শুধুমাত্র ইসলামের প্রসার ও ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান প্রীতিতে সেখানের হিন্দুদের উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করেছে। শুধু ভারত নয়—সমস্ত পৃথিবীতেই ইসলামের এই নীতির বহু ইতিহাস আছে। কাশ্মীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুলমান অঞ্চল বলে তারা যা করতে চাইছে সেটাই সারা ভারতের মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে কি গতি হবে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে—সারা পৃথিবীর কোথাও ইসলাম বিপন্ন হলে আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যম উঠে পড়ে শোরগোল শুরু করে। কিন্তু ঘরের বা পাশের বাড়ীর এই ধরনের সমস্যা নিয়ে তারা নীরব থাকে। আমাদের সরকারও এত দিন ধরে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে অহিংসায় বিশ্বাস করে প্রকৃত রাজধর্ম (রাজনীতি) পালন করছেন না।

—দিলীপ কুমার সরকার, রামলাল বাজার রোড, কলকাতা-৭৮।

কানু সান্যালের আত্মহত্যা

৮১ বছর বয়সে আত্মহত্যা বিষয়টি ভাবতে অবাক লাগে। আমজনতার মনে প্রশ্ন—কানু সান্যাল গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন কেন? উত্তরও সবাই জানে—বেশ কিছু দিন ধরে শারীরিক দিক থেকে যেমন অসুস্থ, তেমনি মানসিক দিক থেকেও সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নিজের জীবনে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সাথে নেতৃত্ব দান করে এসেছে। কৃষক শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য আপোষহীন লড়াই তার জীবনের লক্ষ্য ছিল। নকশাল আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা। আন্তর্জাতিক স্তরে নাম ছিল। হঠাৎ ই আত্মহত্যা মানে মনে অবসাদ, মনের দিক থেকে পরাজিত।

হাতিঘিষা বাজারে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ছেড়েই ডানদিকে অন্দি রাস্তা চলে গেছে সেদুল্লাজোতের দিকে। দুই দিকে প্রচুর সবুজ বাঁশের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে রাস্তা। তবে এক জায়গায় বাঁদিকে দরমার ঘর। উঠানের এক কোণায় বাঁশের মাথায় কমিনিস্ট পার্টির রক্ত পতাকা। ১৯৬৯ সালে ২২ মে থেকে কানুবাবুর ঘরই সি. পি. আই (এম এল) এর সদর দপ্তর। সাধারণ মানুষ থাকে গ্রামে। গ্রাম থেকেই আন্দোলন শুরু। নকশালবাড়ির নামে নকশাল আন্দোলনের জন্ম নকশাল বাড়ীতেই। সেই নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে হতাশাই আত্মহত্যার কারণ।

—জয়রাম মণ্ডল, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভে জুনা আখড়ার অধ্যক্ষ সোহম বাবার সঙ্গে হাজার হাজার নাগা সাধুদের নিয়ে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মৌনী অমাবস্যায় স্নান করলেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক তথা ট্রাস্টী ব্রহ্মচারী মুরালভাই। সেখানে তিনি তীর্থযাত্রীদের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবা-কার্য চালাচ্ছেন।

সমাবেশ সমাচার

ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটির সেমিনার

আশিস গঙ্গোপাধ্যায়॥ গত২৭ এবং ২৮ মার্চ দেশের প্রাচীনতম গাণিতিক সংস্থা ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটি তাদের নিজস্ব ভবনে (আশুতোষ ভবন, AE-374, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064) এক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করেছিল। বিষয় ছিল—Frontier of Mathematics and Applications.

স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক উদয় চাঁদ দে। দুদিনের এই সেমিনারে যে সমস্ত বিশিষ্ট গণিতবিদ্রা নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যরা হলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক দিলীপ কুমার সিন্‌হা, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সামসুল আলম, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস. কে. চক্রবর্তী, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি. এস. কিরানাগী, গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর. ওয়াই. ডেনিস, আই. এস. আইর অধ্যাপক হিমাদ্রি মজুমদার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা জ্যোতি দাস, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাফর আসান এবং শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াই. এস. পাওয়ার প্রমুখ।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্থার বর্তমান সহকারী সম্পাদক ডঃ বলাই চাকী।

'সেন্টিনারি ট্রিবিউট টু চিত্রাচার্য উপেন্দ্র মহারথী' গ্রন্থের উন্মোচন করছেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী। তাঁর ডান দিকে বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, অধ্যাপিকা তৃপ্তি বড়ুয়া, ভিক্ষু বোধিপাল, বাঁ-দিকে ধর্মরত্ন মহাথের ও সম্পাদক হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী।

চক্ষুপরীক্ষা শিবির

গত ২৭ এবং ২৮ মার্চ সমাজ-সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ-এর উদ্যোগে এবং শংকর নেত্রালয়, কলকাতা শাখার সহযোগিতায় হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া ব্লকের পাকড়ি গ্রামের স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিবিরে মোট ৪১১ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। ৬৪ জনকে ছানি অপারেশনের জন্য বাছাই করা হয় এবং এঁদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাংসদ ডাঃ রত্না দে (নাগ) সহ জয়দেব কুণ্ডু, রাধাকান্ত বিশ্বাস, বাসুদেব ঘোষ, অধ্যাপক গৌর চন্দ্র গড়াই ও বহু বিশিষ্ট সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি শিবির পরিদর্শন করেন এবং এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানান। শ্যামল বসু, গোপাল সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণের দক্ষ পরিচালনায় এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় দুইদিনব্যাপী এই শিবির সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

সনাতন হিন্দু ধর্মের ১০৮ টি মূল নীতি

রবীন সেনগুপ্ত

বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি আটটি। এগুলিকে একত্রে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। ইহুদীদের ধর্মের মূলনীতি দশটি, এগুলিকে টেন কমান্ডমেন্টস্ বলে। ইসলামের মূলনীতি পাঁচটি, যথা—নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও জেহাদ।

কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের মূলনীতি ও কর্ম অনেক বেশী। কারণ গ্রামের বাড়িকে যেমন প্রচলিত কথায় দেশের বাড়ি বলি, গ্রাম আর 'সম্পূর্ণ দেশ' দুটিতে বিশাল পার্থক্য আছে জেনেও অভ্যাসবশত বলি। তেমনি ধর্ম আর সম্প্রদায়ে বিশাল পার্থক্য আছে জেনেও সম্প্রদায়গুলিকে আমরা ধর্ম বলি। ইসলাম, খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ এসবই হলো সম্প্রদায়। কাজেই তাদের মূলনীতি ও পুণ্যকর্মের প্রকাশগুলিও অনেক বৃহৎ হবে। সম্প্রদায়গুলি মূলত এই ১০৮টি নীতি ও কর্ম থেকেই নির্বাচিত করে কয়েকটিকে গ্রহণ করে এবং বাকিগুলিকে অস্বীকার করে, বুঝতে চায় না বা ধবংস করতে চায়।

যাই হোক, আমরা এখন বেদ পুরাণ বেদান্ত তন্ত্র মনুসংহিতা ইত্যাদি আকর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত সনাতন হিন্দু ধর্মের ১০৮ টি মূল নীতি ও পুণ্যকর্মগুলির উপর আলোকপাত করি—

(১) সমাজসেবা ও সংগঠনে অংশ নেওয়া, (২) লেখাপড়ার চর্চা করা, (৩) সাকার বা নিরাকার ঈশ্বরে মনঃসংযোগ পূর্বক মন্ত্রজপসহ ধ্যান ও সত্যানুসন্ধান করা, (৪) কীর্তন, (৫) প্রাণায়াম, (৬) যোগাসন (৭) রোগীর চিকিৎসা, (৮) প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা, (৯) বিজ্ঞান গবেষণা, (১০) দেশের সেবায় জীবন অতিবাহিত করা ও প্রয়োজনে প্রাণ বলি দেওয়া, (১১) সনাতন ধর্ম রক্ষা ও প্রসারের জন্য রাজনীতি করা, (১২) প্রশাসনে অংশ নেওয়া, (১৩) সৎভাবে ব্যবসা করা, (১৪) কাব্যচর্চা, (১৫) গদ্য সাহিত্য চর্চা, (১৬) অঙ্কন চর্চা, (১৭) আবৃত্তি চর্চা, (১৮) নৃত্য, (১৯) কণ্ঠসংগীত, (২০) বাদ্যযন্ত্র, (২১) অভিনয়, (২২) ভাস্কর্য চর্চা, (২৩) অনুষ্ঠান পূর্বক দেবদেবীর পূজা করা ও পূজা দেখা, (২৪) শ্রাদ্ধ করা, (২৫) তর্পণ করা, (২৬) জলাশয় খনন ও সংরক্ষণ করা, (২৭) রাস্তা নির্মাণ করে দেওয়া, (২৮) পশু ও পাখিদের সেবা করা, (২৯) ফুলের বাগান নির্মাণ, (৩০) কৃষিকাজ, (৩১) গো-প্রতিপালন ও সংরক্ষণ, (৩২) অরণ্য ও বৃক্ষ সংরক্ষণ (৩৩) বিশেষ তিথিতে উপবাস করা, (৩৪) জ্যোতিষ চর্চা করা, (৩৫) গ্রহরত্ন ধারণ করা, (৩৬) কবচ তাবিজ ধারণ করা, (৩৭) মালা ধারন, (৩৮) তিলক ধারণ, (৩৯) টিকি বা শিখী ধারণ, (৪০) চন্দন দ্বারা মুখ ও দেহ

সজ্জা, (৪১) ভস্ম ধারণ, (৪৩) রুদ্রাক্ষ ধারণ, (৪৪) ধূপধুনার ব্যবহার, (৪৫) বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে আলতা শাখা সিঁদুর ধারণ, (৪৬) সন্তান লালনপালন (৪৭) বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সেবা করা, (৪৮) মেলায় অংশগ্রহণ করা, (৪৯) বিশেষ নদী ও কুন্ডে স্নান করা, (৫০) দেব- দেবীর বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, (৫১) আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, (৫২) অবতার তত্ত্বে বিশ্বাস করা, (৫৩) স্বর্গ-নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, (৫৪) পাপপুণ্যে বিশ্বাস করা, (৫৫) মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করা (৫৬) গুরুর শক্তিতে বিশ্বাস করা, (৫৭) মানত বা মানসিক করা, (৫৮) কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি রিপুকে ঈশ্বরের নিকট বলি দেওয়া, (৫৯) ক্ষেত্র বিশেষে সীমিত সংখ্যক পশু বলি দেওয়া, (৬০) ধর্ম ও ভাল কিছু রক্ষার্থে জীবন বলি দেওয়া, (৬১) সতীত্বের চর্চা করা, (৬২) ব্রহ্মচর্য পালন, (৬৩) বিবাহ ও কামশাস্ত্র সম্মত প্রেমে অংশ নেওয়া, (৬৪) গীতা পাঠ, (৬৫) বেদ পাঠ, (৬৬) উপনিষদ পাঠ, (৬৮) রামায়ণ পাঠ, (৬৯) মহাভারত পাঠ, (৭০) ভাগবত পাঠ, (৭২) অন্যান্য পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ, (৭৩) সর্বপ্রকার নেশার দ্রব্য পরিত্যাগ করা, (৭৪) আমিষ আহার ত্যাগ করা, (৭৫) তীর্থ-ভ্রমণ করা, (৭৬) নগর ও গ্রামকে সাজিয়ে দেওয়া, (৭৭) উপনয়ন বা পৈতা গ্রহণ করা, (৭৮) হোম ও যজ্ঞ করা, (৭৯) শুদ্ধাচার অভ্যাস করা, (৮০) মন্দির ও দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, (৮১) আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা, (৮২) দীক্ষা দেওয়া ও নেওয়া (৮৩) দেহ অলংকৃত করা, (৮৪) বাসগৃহ অলংকৃত করা, (৮৫) নির্জনে বাস, (৮৬) সন্ন্যাস গ্রহণ করা, (৮৭) গুরুর সেবা করা, (৮৮) অর্থ দান, (৮৯) জমি দান, (৯০) গৃহদান, (৯৭) গ্রন্থ দান, (৯৮) সৎসঙ্গ করা, (৯৯) সনাতন হিন্দু ধর্মকে শেষ করে দিতে চায় এমন অসুরদের হত্যা বা দমন করা, (১০০) ধর্মীয় বক্তৃতা প্রদান করা, (১০১) ধর্মীয় গ্রন্থ ও বাণী প্রচার করা, (১০২) ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা, (১০৩) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা, (১০৪) নমস্কার করা ও অভিনন্দন জানানো, (১০৫) সত্য প্রতিপালন করা, (১০৬) প্রেম-ভক্তি ও সরলতার অনুশীলন করা, (১০৭) ঠাকুরের আরতি করা ও দেখা, (১০৮) ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ ও গ্রহণ করা।

১০৮ সংখ্যাটি শাস্ত্রে বিশেষ পবিত্র বলে বর্ণিত আছে। জপমালায় ১০৮টি করে গুটিকা রাখার নির্দেশ, পূজায় ১০৮টি বিশেষ ফুল দেওয়ার নির্দেশ, ১০৮টি উপনিষদের কথা এগুলিও আমরা সনাতন হিন্দু শাস্ত্র থেকেই পাই। তারই অনুসরণ করে এই ১০৮টি মূল নীতি সাজিয়ে দেওয়া হল। আসলে সকল গুণের মূল হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ। এই সব নীতিগুলি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সহায়ক বলে তা আচরণীয়। একজন মানুষ হয়তো এতসব নীতি ও পুণ্যকর্ম করতে পারবেন না, তবে নীতি ও কর্মগুলির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও আস্থা রাখার প্রয়োজন আছে। না হলে অধর্ম বা দুর্নীতি এসে গ্রাস করে নেবে সমাজ ও ব্যক্তিকে।

জীমূতবাহন

ভারতের শাশ্বত মনীষা

চিরন্তন চক্রবর্তী॥ ধর্মশাস্ত্রে বাংলার তিনজন শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয় নিবন্ধকারের মধ্যে জীমূতবাহন অন্যতম।
জীমূতবাহনের সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো দায়ভাগ। বাংলাদেশে উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। হিন্দু ল-এর মূল ও সর্বপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে দায়ভাগ উল্লেখযোগ্য। কারণ বৃটিশ যুগে যে হিন্দু' ল (আইন) রচিত হয় তা জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ, পিতামহের সম্পত্তি এবং তাহার বিভাগ ও অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা নিবন্ধ মিতাক্ষরার সঙ্গে দায়ভাগের মূলগত কতকগুলি পার্থক্য রয়েছে। যেমন দায়ভাগে প্রাদেশিকত্ববাদ নিরূপিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, বঙ্গদেশ, অসম ও নেপালের কিছু অঞ্চ লে দায়ভাগের মত প্রচলিত। এ তিনটি স্থান ব্যতীত দক্ষিণ-পশ্চি ম ও উত্তর ভারতে মিতাক্ষরার মতই গৃহীত।

লর্ড কানে ১০৯০ সাল থেকে ১১৩০ সালের মধ্যে জীমূতবাহনের কাল বলে উল্লেখ করেছেন। অপর পণ্ডিত রায়বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্তী

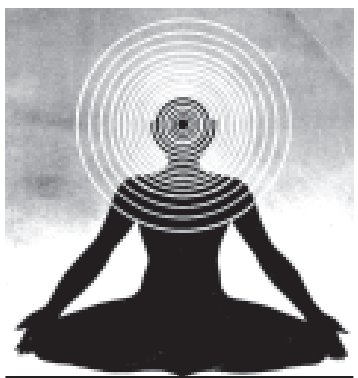

জীমূতবাহন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন বলে মনে করেন। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে দায়ভাগ গ্রন্থের শেষে জানিয়েছেন, তিনি পারিভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই পারিভদ্রকুল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত। এখনও পারিয়াল নামে এই বংশ বর্তমান। কালবিবেক জ্যোতিষের বচন থেকে পাওয়া যায় জীমূতবাহন রাঢ় অঞ্চ লের বাসিন্দা ছিলেন।

জীমূতবাহন যে সময় জন্মেছিলেন সে সময় বঙ্গদেশের ভাগ্যাকাশে একের পর এক ধর্মীয় আন্দোলন ও বৈদেশিক আক্রমণ চলছে। একদিকে বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ জৈন তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্মের প্রসার প্রতিপত্তি ও অন্যদিকে মুসলমানদের আক্রমণ ও অত্যাচার বঙ্গদেশকে সবসময় ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। এই সময় দায়ভাগ গ্রন্থ জীমূতবাহনের অপরিসীম পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মতার পরিচয় বহন করে। জীমূতবাহনের অপর গ্রন্থ 'ব্যবহার মাতৃকা'-তে বিচারবিভাগীয় রীতিনীতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর আর গ্রন্থ 'কালবিবেক' গ্রন্থের বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন আচার বিষয়ক কাল। এই গ্রন্থের যথাযথ ঋতু মাস দিন মুহূর্ত প্রভৃতি কাল গণনা ধর্মীয় আচারাদি অনুষ্ঠান করতে ব্যবহার হয়।

জীমূতবাহনের 'ব্যবহার মাতৃকা' জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সে দেশের আইনের ছাত্রছাত্রীদের এই গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করতে হয়। তবে অবশ্যই জার্মান ভাষায়।

এস. জি. পি. সি-র নতুন সংস্করণ

নানকশাহী ক্যালেন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বহু-বছর বির্তকের পর শেষমেশ সংশোধন করা হলো শিখদের ধর্মীয় ক্যালেন্ডার নানকশাহী। শিখ সম্প্রদায়ের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ এই ক্যালেন্ডার থেকে পাওয়া যাবে। শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি (এস. জি. পি. সি.)-র পক্ষ থেকে গত ৩ মার্চ, অমৃতসরে নানকশাহী ক্যালেন্ডারের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।

আগের নানকশাহী ক্যালেন্ডারের তারিখের সঙ্গে বিক্রম সম্বত দিনপঞ্জীর কোনও মিল ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যে নানকশাহীর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বিক্রমী কালেন্ডারের সঙ্গে বহু মিল রয়েছে। শিখদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনেকগুলি তিথি এখন বিক্রম সম্বতের তিথিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

জাঠেদার অকাল তখত জ্ঞানী গুরুবচন সিং এবং এস. জি. পি. সি- র জ্ঞানী অবতার সিং মকর সম্মিলিতভাবে নানকশাহী ক্যালেন্ডারের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির থেকে।

জ্ঞানী গুরুবচন সিং-এর মতে সমগ্র বিশ্বে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে নানকশাহী ক্যালেন্ডারের সংশোধিত সংস্করণ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে—এটাই তারা আশা করেন। যদিও শিখ সম্প্রদায়ের একাংশ নানকশাহীর সংশোধিত সংস্করণ তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। তারা পুরোনো সংস্করণকেই অনুসরণ করবে বলে জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে নানকশাহী ক্যালেন্ডারের এই সংস্করণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে বলে তারা অভিযোগ করেছেন। জাঠেদারের মতে কালেন্ডারের সংশোধন আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। কারণ ঘন্টার হিসাবে দিনের পরিবর্তন ঘটায় এই পরিবর্তন। তাই শিখ বুদ্ধি জীবীদের অভিমত নিয়ে নানারকম গাণিতিক হিসাবের কষ্টিপাথরে বিচার করে ক্যালেন্ডারের সংশোধনী সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।

এ বছরের ৩ জানুয়ারী স্বর্ণমন্দিরের চত্বরে অবস্থিত শিখ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ আসন অকাল তখত-এ শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক সমিতির (এস জি পি সি) বৈঠক হয়। এস. জি. পি. সি-র সম্পাদক দালমেশ সিং জানান যে নানকশাহী ক্যালেন্ডারের পরিবর্তন করা হবে। অপরদিকে অন্যান্য শিখ দলগুলি যেমন দল খালসা, খালসা অ্যাকশান কমিটি, শিরোমণি পান্থিক কাউন্সিল (এস. পি. সি) নানকশাহী ক্যালেন্ডারের সঙ্গে বিক্রমী ক্যালেন্ডারের মিশ্র সংস্করণের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু শেষ অবধি এস. জি. পি. সি. সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে নানকশাহী কালেন্ডারের নতুন সংস্করণ বলবৎ থাকবে এবং সংস্থার বিশ্বাস যে মানুষের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে।

নারী সমাজে এক নতুন ইতিহাস

ইন্দিরা রায়

২০১০-এর ৮ মার্চ একটা ঐতিহাসিক দিন হয়ে থাকবে নারী সমাজের ইতিহাসের পাতায়। একদিকে এ বছরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষ হলো ৮ মার্চ, সেইসঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত বিতর্কিত ৩৩ শতাংশ মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল রাজ্যসভায় গৃহীত হলো। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর আশা-হতাশার দোলায় দোদুল্যমান থেকে শেষপর্যন্ত আশার আলো দেখল এদেশের সমগ্র নারী সমাজ। রাজ্যসভায় ১৮৬-১ ভোটে পাস হয়ে গেল সংবিধান সংশোধনী বিলটি। এরপর যদিও লোকসভায় সংশ্লিষ্ট বিলটিকে নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে তবুও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের নতুন পথ রচনায় এর তাৎপর্য অপরিসীম। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে বিলে। বিল ঘিরে কট্টর বিরোধিতা গড়িয়েছে সমর্থন প্রত্যাহারে। ইউ পি এ সরকারের গরিষ্ঠতা ঠেকেছে তলানিতে। এই অবস্থাতেও বিল পাস করানোর ব্যাপারে অনড় থেকেছেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। মহিলা বিল নিয়ে লড়াই -এর পরের মঞ্চ লোকসভা। বিল পাস হয়ে গেলে লোকসভার ৫৪৩ আসনের মধ্যে ১৮১টি সংরক্ষিত হয়ে যাবে মহিলাদের জন্য। কিন্তু তার আগে নিশ্চিতই পেরোতে হবে অনেক ঝড়ঝাপটা। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিন্তু এই আপাত-নিরীহ সম্ভাবনাটাই দূর অস্ত।

পেছন ফিরে তাকালে স্পষ্টতই দেখা যায়, গণতান্ত্রিক দেশে মহিলাদের অবস্থান চিরকালীন একই, অবদমন, অত্যাচার নিপীড়ন প্রাপ্য তাদের। পরবর্তীকালে শিক্ষার আলো ঘেরাটোপ জীবনে প্রতিফলিত হলেও তাদের স্বাধীনতায় কোনও পরিবর্তন আসেনি। কী কর্মক্ষেত্রে, কী শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলার কৃতকার্যতা কখনই সুনজরে আসেনি এবং আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে এসেছে শত বাধা। আজও নারী-স্বাধীনতা নিয়ে নারী যতই উচ্চকিত হোক না কেন; কার্যক্ষেত্রে সে এখনও পরাধীন তার নিজস্ব পারিবারিক গণ্ডিতে। সেটা মেনে না নিলেই নারীর পরিচয় স্বেচ্ছাচারী, উদ্ধত হিসেবে।

সি পি আই নেত্রী প্রয়াত গীতা মুখার্জি মহিলা আসন সংরক্ষণের জন্য আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও আরও চৌদ্দটা বছর পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বিল পাস হলো। এই বিলে কি আছে তা সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে। সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। বিলে আছে যে, লোকসভা এবং বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য, আসন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সংরক্ষিত হবে, রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদে প্রযোজ্য নয়, সময়সীমা ১৫ বছর। পরে সংসদ সেই মেয়াদ বাড়াতে পারে। বিল সংক্রান্ত বিষয় জানা গেল। কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে, রাজ্যসভায় বিল উত্থাপনে যখন রাজনীতিক মহলে এত চাপান উতোর, তাহলে এরপরে লোকসভায় কি পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে! সেই ব্যাপারে এটাই হতে পারে যে, লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতায় পাস করাতে হবে, চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন রাষ্ট্রপতি, অন্তত অর্ধেক সংখ্যক রাজ্যে বিল পাস করাতে হবে;সংরক্ষিত আসন নির্ধারণের জন্য আরও একটি বিল পাস দরকার, এরপর নির্বাচন কমিশন আসন নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি দেবে।

উপরোক্ত বিষয়টি মাথায় রেখে এখনই উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু হয়নি। সাধারণ শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে এই বিল পাস সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া কি জানতে যে মতামত পাওয়া গেল, তাতে সকলের বক্তব্যে একটাই কথা স্পষ্ট হলো যে, মহিলাদের স্বীকৃতি দেওয়া হলো এবং তার ফলে মহিলাদের কিছু বক্তব্য কিছু মতামত রাখার একটা জায়গা তৈরি হলো। কিন্তু মহিলা বিল পাস মানেই যে নারী সমাজ উচ্চকিত বা আনন্দিত তা নয়। এক্ষেত্রেও দেখা গেছে রাজনীতিক স্বাধীন নেত্রী স্বয়ং এর বিরোধিতা করেছেন।

মহিলাসংক্রান্ত যে কোনও কাজেই ঝুঁকি থাকে;কারণ তা সহজে সকলে মেনে নেয় না। ঠিক সেই একই সংশয়ের দোলায় এই ব্যাপারটা দোদুল্যমান। এখন আরও বড় চ্যালেঞ্জ সরকারের—লোকসভায় বিল পেশ ও পাস করার বিষয়টা। এ নিয়ে যা হবে সেটা পরবর্তী পদক্ষেপ। কিন্তু এই বিল নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে যাঁরা বলে এসেছেন, সে সব মহিলাদের কথা এ প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে কস্তুরবা গান্ধী, অ্যানি বেসান্ত, কমলা নেহরু, সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃত কাউর, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ইন্দিরা গান্ধীর নাম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, শুধু মহিলাদের জন্যই লড়াই নয়, তবে মহিলাদের অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার জন্যই একবিংশ শতাব্দিতে এ লড়াই। এটা পুরুষ-মহিলা হাতে হাত ধরে অধিকার অর্জনের আইন। প্রকৃতপক্ষে মহিলারা সর্বক্ষেত্রেই লাঞ্ছিত, তাই আজকের এই পদক্ষেপ প্রকৃত ইতিহাস হয়ে উঠল। আজকের এই পদক্ষেপ আগামী দিনে মেয়েদের আশঙ্কা পূরণের, সামাজিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সোপান হবে। কিন্তু অনগ্রসর মহিলাদের জন্য এই আইনে সংরক্ষণের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। আজকের যুগে নিরক্ষর, অনগ্রসর মহিলারাও কিন্তু নিজেদের অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই, সেইসব শ্রেণীর মহিলারা কিন্তু এই বিল সম্পর্কে ততটা উৎসাহী নন। সম্প্রতি সেই ধরনের মন্তব্য করেছেন হামিদ আনসারির সহধর্মিনী নিজেই। তাঁর গৃহিণী সালমা বিরোধিতা

করেছেন তাঁর স্বামীর আনা এই বিলে। তাঁর বক্তব্য যে, সমাজের নিচের স্তরে যার সুফল পৌঁছবে না, সে বিলে কি লাভ!

এই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু কেন্দ্রীয় সরকার নয়; এখন রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত এবং পুরসভাতে ৫০ শতাংশ মহিলাদেরও আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব এনেছে। মহিলাদের জীবনে এটা একটা বড় স্বীকৃতি। সব দিক দিয়ে এই বছরের অর্থাৎ ২০১০-এর ৮ মার্চ নারীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন হয়ে রইল। একদিন নারী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রতিবাদী হয়েছিল এমন একটি দিনে, শতবর্ষে পা রাখা সেই দিনটিতে নারী রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রধান বিরোধী দলের সহায়তায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসভায় ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিল পাস করতে সক্ষম হলো।

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।। ৭

পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিনে মহাপ্রভু ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন করতে করতে রথের আগে আগে চললেন।

মহাপ্রভুর স্পর্শে অচল রথ সচল হল।

ওড়িশার মহারাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সাক্ষাৎপ্রার্থী। মহাপ্রভু রাজি নন। তাই প্রতাপরুদ্র ছদ্মবেশে ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে মহাপ্রভুর কাছে গেলেন। ভাবাবেশে মহাপ্রভু রাজাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (চলবে)

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এলে শিক্ষার প্রসারই ঘটবে

তারক সাহা

গত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশ হয়ে গেল। আইনে পরিণত হতে বাকি কেবল সংসদীয় সীলমোহর। গণ্ডগোল বেধেছে এখানেই। মহিলা সংরক্ষণ বিলের মতো কিছু দলের এতে আপত্তি রয়েছে। এর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে বামপন্থী তথা এদের প্রধান শরিক সিপিএম। এ যাবৎ সমস্ত নতুন নতুন প্রকল্পে এরা বাধা দিয়ে এসেছে।

আগে আলোচনা করা দরকার বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এদেশে উচ্চ শিক্ষায় কী কী পরিবর্তন আনতে পারে? উচ্চশিক্ষা আম-আদমির জন্য নয়। আমাদের দেশে যে সব উচ্চ মেধার ছাত্র-ছাত্রী তৈরি হচ্ছে, এদের অধিকাংশই আরও উচ্চশিক্ষার আশায় বিদেশে পাড়ি দেয়। দেশে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাঁরা বিদেশেই থেকে যায় এবং বংশ পরম্পরায় সেই দেশের নাগরিক হয়ে বাস করেন। আবার এঁদের অনেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হন সে দেশে তাঁদের কৃতিত্বের জন্য এবং এই পদক প্রাপ্তি সেই দেশেরই গৌরব বাড়ায় যদিও পদক প্রাপক ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

আজ বিশ্বায়নের যুগে সমস্ত পণ্য যখন বাজারে বিক্রি হয়, তেমনই শিক্ষা, মেধা সবই বৃহৎ অর্থে পণ্য। অন্য হরেক পণ্য যখন আমদানি-রপ্তানি যোগ্য তেমনিই শিক্ষা নয় কেন? নিন্দুকেরা বলবে এতে পিছনের দরজা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের প্রবেশ ঘটবে। অতীতে বাণিজ্যের নাম করে এসে ইংরেজরা এদেশে সাম্রাজ্য ফেঁদে বসেছিল—এমন সব আশঙ্কার কথাই তারা ব্যক্ত করেছেন।

আমাদের এদেশে বুনিয়াদি স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত সর্বস্তরেই ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন। এক দেশে, এক শিক্ষানীতি প্রয়োগ সারাদেশে শিক্ষাকে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় তালিকায় আনা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখায় পাশ্চাত্য দেশগুলি প্রভূত উন্নতি করেছে। তাদের লব্ধ জ্ঞান শিখতে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের অনেক পয়সা খরচ করে বিদেশে যেতে হয় পড়াশুনা করতে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশেষত নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি তাদের শাখা এদেশে খোলে তবে দেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিযোগিতায় উত্তরণ ঘটিয়ে নিজেদের পঠন-পাঠনেও উৎকর্ষতা আনতে পারবে। নিন্দুকেরা বলছে যে, এমন বিবর্তন ঘটলে দেশের ভাল অধ্যাপকেরা ভিড় জমাবেন ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী উপার্জনের আশায়। যদিও এমন আশঙ্কা তেমন অমূলক নয়। মহার্ঘের এই যুগে অবশ্যই কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে সরকার দাক্ষিণ্য আশা করতে পারে না। অবশ্যই এমনসব ক্ষেত্রে সরকারের দেখা উচিত যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন বেতন বৈষম্য তৈরি করতে না পারে।

অষ্টাদশ শতকে যেভাবে বাণিজ্যের নাম করে ইংরেজরা এদেশে সাম্রাজ্য গড়ে ছিল তেমনটা আর সম্ভব নয় একবিংশ শতকে। কাজেই নতুন করে আমরা আবার স্বাধীনতা হারাবো এমনটা ঘটবে না। ইদানীংকালে বামেদের সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা স্থানকাল ভেদে বিভিন্ন। আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি সহ পরমাণু দায়বদ্ধ তা বিলের চুক্তির বিরোধিতা করে এসেছেন কারাটরা। অথচ হরিপুরে যেহেতু পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য সাহায্যে এগিয়ে এসেছে রাশিয়া তাই কারাটদের তাতে আপত্তি নেই। অথচ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রাশিয়া-আমেরিকা এদেশের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী। অথচ কারাটদের দ্বিচারিতায় রাশিয়া আমাদের দোসর, অথচ আমেরিকা গণশত্রু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

অতীতে বিমাক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ নিয়ে অনেক বিরোধিতা করেছে বামেরা। কিন্তু দেশে এত বিনিয়োগ সত্ত্বেও বিমা ব্যবসায়ে হারিয়ে যায়নি অর্ধশতায়ু জীবন বিমা সংস্থা। বরং প্রতিযোগিতার ঠেলায় সরকারি জীবনবিমার বিভিন্ন সার্ভিসের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে।

বিশ্বায়নের যুগে আমরা দেখেছি প্রতিযোগিতায় নামলে সেবার উৎকর্ষতা বাড়ে। বামেদের ভয় ছিল বিমা বেসরকারীকরণের ফলে কর্ম সংকোচন হবে। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা ঘটেনি, উল্টে বিভিন্ন বেসরকারী বিমায় এজেন্ট সহ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হয়েছে। আমাদের দেশে যখনই কোনও পরিবর্তনের চেষ্টা হয়েছে তখনই বামেরা তা বানচাল করতে তৎপর হয়েছে। চুরাশি সালে রাজীব সরকার শ্যাম পিত্রোদার নেতৃত্বে যখন কম্পিউটার প্রচলনের ব্যবস্থা করেছিল এদেশে তখন বামেরা কর্মসংকোচনের অছিলায় বিরোধিতা করেছিল।

সুতরাং শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এদেশে তাদের শাখা খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকার নিলে তার প্রধান বিরোধিতা যে আসবে বামেদের কাছে তা একরকম জানাই এবং এর মূল কারণ যতটা না নীতিগত তার চেয়ে বড় রাজনীতি। শিক্ষাকে যদি কেন্দ্রীয় তালিকায় আনা হয়, তবে ক্ষতি হবে যাদের তারা হলো বামপন্থী। কারণ শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় যতদিন থাকবে রাজনীতিতে তাদের ফায়দা তত বেশী। দরকার না থাকলেও, শিক্ষার মান না বাড়লেও একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় গঠন বাম জমানায় রাজনীতিরই অঙ্গ। কেবল রাজনীতির রং দেখে অযোগ্য শিক্ষাবিদদের এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বসানো, অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য অধ্যাপকদের বিভিন্ন পদে নিযুক্তি—এসবই এ রাজ্যে শিক্ষাকে যুগ্মতালিকাভুক্ত করার বিষময় ফল।

কাজেই এরা যে যারপরনাই বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশে বাধাদান করবে এটা খুব স্বাভাবিক। সুতরাং বামেদের যখন রাজনৈতিক বিপর্যয় শুরু, বামেরা যখন টিকে থাকার জন্য খড়কুটো খুঁজছে, তখন কিন্তু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সরকারী প্রচেষ্টাকে প্রধান হাতিয়ার করতে চাইছে বামেরা। সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় যে, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা বা জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এদেশে তাদের শাখা খোলার প্রচেষ্টাকে বাধাদান করলেও;রাশিয়া, চীন, কিউবা বা ভিয়েতনাম যদি এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব যদি দেয় এদেশের রুশ-চৈনিক বন্ধুরা তাকে দুহাত তুলে স্বাগত জানাবে। কিন্তু মুশকিল হলো ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থেকে অনেক নীচে।

সুতরাং বামেরা যত জুজুর ভয় দেখাক কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাবে আম-আদমি। উচ্চশিক্ষার মান বাড়াতে, এ দেশের মেধা পাচার বন্ধ করতে, শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মীদের মানের উন্নয়নের জন্য বিশ্বায়নের এ যুগে অবশ্যই জ্ঞানের আদান-প্রদান জরুরী। মানব সভ্যতার উত্তরোত্তর বিকাশে শিক্ষা আজ সেরা শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছেছে। কোনও ছুঁতমার্গ না রেখে শিক্ষায় বিশ্বায়নে দেশের জানালাকে উন্মুক্ত করে এক দেশ, এক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এক বোর্ড, এক সিলেবাসের ছত্রছায়ায় দেশের আপামর শিক্ষার সংস্কার অত্যন্ত জরুরী এদেশের ক্ষেত্রে। সমস্যা, বাধা প্রচুর, তবে এই দিশায় কপিল সিববালের ব্যক্তিগত প্রয়াস অবশ্যই স্বাগত।

বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা

(৮ পাতার পর)

হ্রাস যেন কখনও না হয় তাও সুনিশ্চিত করা উচিত। পঞ্চ গব্য-এর ব্যবহার এবং বিভিন্ন ঔষধি ও অন্যান্য উৎপাদনের ফলে গ্রামীণ জনতার আয় বাড়ানো যেতে পারে। এরকমভাবেই গোবরগ্যাস, বলদচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োগে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ হতে পারে। গো-কেন্দ্রিক গ্রামবিকাশের দ্বারা গ্রামীণ ক্ষেত্রেও সমৃদ্ধি নিয়ে আসা সম্ভব। এজন্য পরিপূর্ণভাবে গো-ভিত্তিক বিজ্ঞান কারিগরি বিষয়ে গবেষণা এবং গবেষণা লব্ধ বিষয়ের প্রচার-প্রসার এবং পাঠ্যসূচীতে তার অন্তর্ভুক্তি হওয়া চাই।

বিগত কয়েক বছরে ভারতে উপরোক্ত বিষয়ে সামাজিক কার্যকর্তা ও বৈজ্ঞানিকেরা বেশ কিছু অগ্রগতি করেছেন। এর ফলে বিভিন্ন গো-শালাতে পরম্পরাগত উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ গব্য-ঔষধিরও উৎপাদন শুরু হয়েছে। এসকল প্রয়োগ দেখে মনে হচ্ছে—মূল ভারতীয় প্রজাতির গো-বংশ সংরক্ষণ, সংবর্ধন এবং উন্নত প্রজাতির নির্মাণ লাভদায়ক। প্রতিনিধি সভার মতে এসকল যাবতীয় প্রয়াসের সমন্বয় এবং সুসংগঠিত করা একান্ত আবশ্যক। জৈবিক কৃষির প্রয়োগ কয়েকটি প্রদেশে হচ্ছে—তা আরও বিস্তৃত করতে হবে। গোশালার প্রতিটি গরুর জন্য প্রতিদিনের হিসেবে দেয় অনুদান সম্বন্ধে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের রায় প্রতিটি রাজ্যের পক্ষেই গোরক্ষার ক্ষেত্রে এক অনুকরণীয় পদক্ষেপ বলে গৃহীত হতে পারে।

আমাদের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে গোরক্ষার কথা রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ, জলস্রোত এবং বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ ও সংবর্ধন—সরকার এবং নাগরিকদের কর্তব্য তথা প্রাণীমাত্রের প্রতি করুণার কথা বলা হয়েছে। গুজরাট সরকারের সম্পূর্ণ 'গোহত্যা-নিষেধ' আইনকে ২০০৫ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে সর্বোচ্চ আদালতের সাত সদস্যের বেঞ্চ সমর্থন করেছে যা সংবিধানের বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিকেই সমর্থন করছে। যে সকল রাজ্যে 'গোরক্ষা' সম্পর্কিত আইন রয়েছে, তাকে আরও দৃঢ় করা এবং যথাযোগ্যভাবে কার্যকরী করা দরকার। কর্ণাটকের সাম্প্রতিক গোরক্ষা সম্পর্কিত আইন সকল রাজ্যের জন্য অনুকরণযোগ্য উদাহরণ।

কেন্দ্র সরকারের গোমাংস রপ্তানীতে অনুদান সমাপ্ত করে গোহত্যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা উচিত। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল—সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি, সর্বোচ্চ আদালতের রায় এবং বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রায় দৃষ্ট জনভাবনার প্রবল অভিব্যক্তির পরেও কেন্দ্র তথা রাজ্য সরকারগুলো নিজেদের কর্তব্য পালন না করেন তাহলে গণতন্ত্র তথা সংবিধানের মনোভাবনাকে অবহেলা করা হবে। প্রতিনিধি সভা কেন্দ্র তথা সকল রাজ্য সরকারের কাছে আগ্রহ করছে—

১। পরিপূর্ণভাবে গো-হত্যা নিষেধ। আইন প্রণয়ন করে তা ভালেভাবে কার্যকরী করার দিকে নজর দিয়ে প্রতিবেশী দেশে গো-পাচার এবং গরু চুরি বন্ধ করা।

২। ভারতীয় প্রজাতির গরুকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ঘোষণা করে তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্য যথাসম্ভব প্রয়াস।

৩। ভারত সরকার যেন গোশালা, দেশীয় প্রজাতির গরু, গোচারণ ভূমি, গোবর গ্যাস এবং বলদচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র, জৈবিক এবং প্রাকৃতিক কৃষি তথা পঞ্চ গব্য চিকিৎসা এবং গো-সংবর্ধনের মতো বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৪। দেশের গ্রামগুলি যাতে স্বাবলম্বী এবং সমৃদ্ধ হয় সেজন্য শিক্ষা চিকিৎসা এবং পরিবহণের সুযোগ সুবিধা প্রদান। ভূমি এবং জল সংরক্ষণের জন্য সবরকম প্রয়াস করা। গ্রামোদ্যোগ এবং বিদ্যুতের উৎপাদনে বিভিন্নরকম পদ্ধতিতে সচেষ্ট হওয়া।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভা সকল ভারতবাসী এবং বিশেষত স্বয়ংসেবকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, বিশ্বমঙ্গল গ্রোগ্রাম যাত্রা'র বার্তা—"চলে গাঁও কী ঔর, চলে গায় কী ঔর, চলে প্রকৃতি কী ঔর" সার্থক করার জন্য সক্রিয় ও সচেষ্ট হন।

শোক-সংবাদ

গত ৩০ মার্চ কলকাতা মেডিকেল কলেজে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে হাজারিলাল ধাড়া (ব্যবস্থা প্রমুখ, আর এস এস, পূর্বস্থলী থানা)-র মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও কন্যাসহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

★★★

গত ৫ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রঞ্জিত পাহাড়ী পরলোক গমন করেছেন। তিনি গত কয়েক বছর ধরে ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বৎসর। তিনি ঝাড়গ্রাম শাখার মূল স্বয়ংসেবক। পরবর্তীকালে আসানসোল নগরে সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মৃত্যুকালে স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে গেছেন।

দিল্লীতে সবুজ স্টেডিয়াম

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। বেজিং অলিম্পিক থেকে বোধ হয় শিক্ষা নিয়েছে এদেশের ক্রীড়াকর্তারা। তাই দিল্লিতে আসন্ন কমনওয়েলথ গেমস যাতে পরিবেশ বান্ধব গেমস হয় তার জন্য সবুজের অভিযানের ডাক দিয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা। প্রতিটি স্টেডিয়াম ও ইন্ডোর হলের

আশেপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সবুজ দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এমনকী সদ্য নির্মিত ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামটি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেতে বাধ্য।

এই স্টেডিয়ামে হবে নেটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা। টেবল টেনিসের কিছু খেলা তালকোটরা ইন্ডোরেও হবে। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর চারপাশে গড়ে তোলা হয়েছে সবুজের সমারোহ। স্টেডিয়াম কম্পাউন্ডে ঢুকলে মনে হবে যেন নন্দনকাননে এসেছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত সম্প্রতি স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করে বলেছেন, এটি দেশের একমাত্র গ্রীন ভার্জ স্টেডিয়াম। দীর্ঘদিনের নিখুঁত পরিকল্পনা ও স্থাপত্য শিল্পের কারিগরি উৎকর্ষতার প্রতিফলন এই স্টেডিয়াম। যা দিল্লির অন্যতম অভিজ্ঞানও বটে।

এই স্টেডিয়ামে ভারতীয় আলো জ্বলবে সৌরশক্তি থেকে। স্টেডিয়াম চত্বরে সর্বত্র গাছের সঙ্গে সবুজ রঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে। ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রী এম এস গিল বলেছেন, বিশ্বের যে কোনও উন্নত দেশের স্টেডিয়াম ও তার আউটলেটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে ত্যাগরাজ স্টেডিয়াম। প্রায় ৬ হাজার লোক এখানে বসে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধেসহ খেলা দেখতে পারবে। মিডিয়া কভারেজের জন্য অত্যাধুনিক পরিষেবা ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে শুধু ত্যাগরাজই নয় কমনওয়েলথ গেমসের জন্য নির্মিত বা সংস্কারিত প্রতিটি ক্রীড়া কেন্দ্রেই মিডিয়া ও দর্শকদের জন্য সব রকমের পরিষেবা প্রদান করা হবে। আর শুধু ত্যাগরাজ স্টেডিয়াম নির্মাণ করতেই খরচ হয়েছে প্রায় তিনশো কোটি টাকা। আর তার চারপাশের সৌন্দর্য্যায়নের জন্য আরো কয়েক কোটি।

শব্দরূপ - ৫৪৪

সুবর্ণলতা ঘোষ

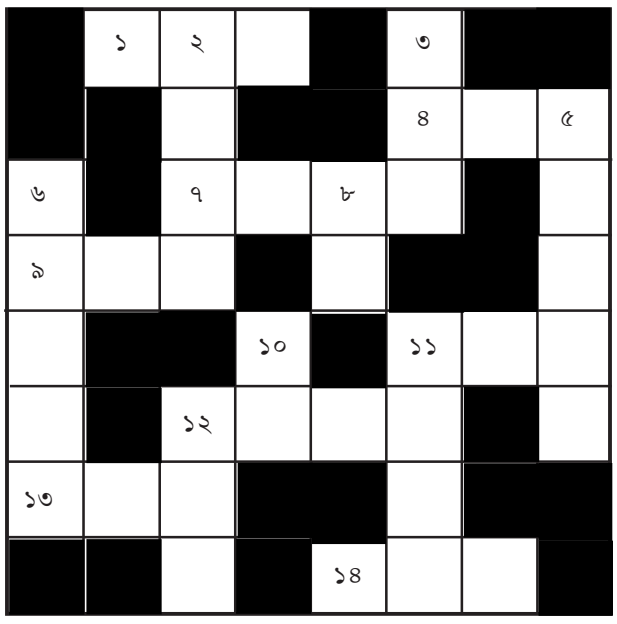

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. সূর্যের সারথি, গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ৪. শ্রীরামচন্দ্র, রঘুর বংশধর, ৭. মহাভারতে পাণ্ডবদের জীবন্তদগ্ধ করার জন্য দুর্যোধনের চক্রান্তে গালা দিয়ে নির্মাণ বাসস্থান, ৯. অল্প ঘি বা তেলে ভাজা রুটি বিশেষ, ১১. ব্রহ্মার মানসপুত্র ও প্রজাপতি গণের মধ্যে অন্যতম, এঁর স্ত্রীর নাম ক্ষমা, একে-দুয়ে সাঁকো, শেষ দুয়ে কাব্যের নাও, ১২. জীব দেহধারী দেবতা, ১৩. অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে দংশনকারী সাপবিশেষ, অষ্টনাগের অন্যতম, ১৪. কৈকেয়ীর পুত্র, এঁর স্ত্রী মান্ডবী।

উপর-নীচ ঃ ২. শিবের কেশরাশি, ৩. বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, একে-দুয়ে শুকর, ৫. অর্জুনের এক পুত্র, মাতা চিত্রাঙ্গদা, আগাগোড়া জঙ্গল, ৬. পরাজিত হয়নি বা হারেনি এমন, ৮. তৎসম শব্দে শকুনপাখি, ১০. মহাদেব, ১১. ইন্দ্র, প্রথম দুয়ে গৃহ, ১২. কেতুগ্রহের নাম, কেশহীন।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৪২

সঠিক উত্তরদাতা

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া, বেড়াবেড়িয়া, বাগনান, হাওড়া-৩

শৌনক রায়চৌধুরী কলকাতা-৭০০০০৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

অ	ম	রা	ব	তী	■	■	ম
■	হা	■	■	ব্র	■	■	থু
■	শ্বে	■	■	তা	ন	পু	রা
পা	তা	ল	■	■	র্ম	■	■
■	■	বে	■	■	দা	মা	মা
গা	ত্র	দা	হ	■	■	হা	■
ণ্ডী	■	■	ং	■	■	স্না	■
ব	■	■	স	চ্চি	দা	ন	ন্দ

● ৫৪৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩ মে, ২০১০ সংখ্যায়

পাঁচ নম্বরে উঠে এলেন সাইনা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একই শহরের দুই মেয়ে; অথচ চরিত্র, আচার-আচরণে কত পার্থক্য। আর ক্রীড়ায়ত দক্ষতাও গৌরবের মানদণ্ডে উত্তর-দক্ষিণ মেরু দূরত্ব। সানিয়া মির্জা সুন্দরী হবার দৌলতে ও রঙচঙে পোষাক, সাজগোজের বাহারে সবসময় মিডিয়ার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকেন। সুপার সেলিব্রিটি স্ট্যাটাস উপভোগ করেন দেশের সর্বত্র। অন্যদিকে সাইনা নেওয়াল তার কাজ করে যান নিঃশব্দে। নিস্তরঙ্গ জীবনচর্চায় বিশ্বাসী কিন্তু সাইনা অলক্ষ্যে তুঙ্গ স্পর্শী। প্রতি বছর কেরিয়ার র‍্যাঙ্কিং বাড়িয়ে যাচ্ছেন ও দেশের মহিলামহলকে ধাঁধায় ফেলছেন।

সাইনা নেওয়াল যতই ভাল পারফর্ম করুক না কেন, তাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হন না এদেশের মেয়েরা। স্কুল-কলেজের ছাত্রী থেকে গৃহবধূ, অশিক্ষিত থেকে বিদগ্ধ মহিলাকূল কেউই তার খেলা নিয়ে মাথা ঘামান না। সবাই মজে আছেন সানিয়াকে নিয়ে আর মেতে থাকেন বলিউড মোহিনীদের ভ্রষ্টাচার ও অন্তঃসারমূল্য কার্যকলাপের চুলচেরা বিশ্লেষণে। অথচ সবঅর্থেই দেশের প্রকৃত গুণী দুই ক্রীড়া তারকা সাইনা ও দাবার সুপার উম্যান গ্রান্ডমাস্টার কোলেরু হাম্পির বিষয়ে আট থেকে আশি কোনো বয়সের মানুষের ন্যূনতম আগ্রহ নেই। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।

কাকতালীয় ব্যাপার হলো সানিয়া, সাইনা, কোলেরু প্রায় সমসাময়িক ও একই রাজ্যের বাসিন্দা। সানিয়া ও সাইনা হায়দ্রাবাদ নিবাসী আর কোলেরু কয়েকশো মাইল দূরের গুন্টুরে থাকেন। সাইনা বা কোলেরু কেউই সানিয়ার গ্লামার, জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত নন। দুজনেই নিজ ক্ষেত্রে জগৎসভা আলো করে বসে আছেন যে! বিশ্ব মহিলা দাবার ক্রমপর্যায়ে এই মুহূর্তে কোলেরু হাম্পি রয়েছেন দু নম্বরে। আর বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে যে সর্বশেষ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে র‍্যাঙ্কিংয়ের নিক্তিতে সেখানে ৫ নম্বরে উঠে এসেছেন সাইনা। ব্যাডমিন্টনের সর্বশ্রেষ্ঠ টুর্নামেন্ট বা অন্যার্থে অলিখিত বিশ্ব চাম্পিয়নশিপ বলে স্বীকৃত অল ইংল্যান্ড চাম্পিয়নশিপে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে সাইনা সেমিফাইনালে পৌঁছোন। ধাপে ধাপে তার উত্তরণ হচ্ছে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে। ২০০৮-এ দুটি টুর্নামেন্ট চাম্পিয়ন হন সাইনা। তার পরের বছর একটি টুর্নামেন্টে জেতেন আর বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে গিয়ে হারেন। বেজিং অলিম্পিক ২০০৮ তার র‍্যাকেটের জাদু দেখেছে। দুর্ভাগ্য কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেও পায়ের পেশীর আঘাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ম্যাচ খেলে এক প্রকার ওয়াকওভার দিয়ে দেন প্রতিপক্ষকে। না হলে অলিম্পিকে পদকও হয়ত জুটে যেত সাইনার, যেরকম করে প্রথম থেকে প্রতিটি ম্যাচ বের করেছেন বেজিংয়ে, তাতে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না বোধহয়।

ভারতের দুই প্রাক্তন অল ইংল্যান্ড খেতাবধারী প্রকাশ পাড়ুকোন ও পুল্লেলা গোপিচাঁদ মনে করেন প্রথম মহিলা হিসেবে সাইনাও এ সম্মান পেতে পারেন। সাইনার খেলায় বিশেষ কোনো খুঁত নেই। চিনা, কোরিয়ান মেয়েদের মহড়া নেওয়ার মতো আক্রমণাত্মক পাওয়ার গেম খেলতে পারেন আবার প্রয়োজনে ডিফেন্স মজবুত করে হতোদ্যমও করে দিতে পারেন বিপক্ষের সব জারিজুরি। শুধু দরকার আরও অ্যাথলেটিক রিফ্লেক্স আর পাযের পেশীর নমনীয়তা। ফিটনেসে চূড়ান্ত পর্যায়ে মার খেয়ে যাচ্ছেন শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ম্যাচে। ইউরোপে ট্রেনিং করে ও ধারাবাহিক ম্যাচ খেলে নিজের গতি, রিফ্লেক্স বাড়িয়ে নিতে পারলে সাইনার আগ্রাসন কেউ আটকাতে পারবে না।

এভারেস্টে চিরশায়িত হিলারি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। স্যার এডমন্ড হিলারির দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে। তাঁর আত্মা এতদিনে বোধহয় চিরশান্তি ও মুক্তি পাবে। এইবারের এভারেস্ট আরোহনকারী শেরপা আপা শেরপা সামনের মাসে তার কুড়িতম এভারেস্ট অভিযানে যাচ্ছেন এক বৃটিশ অভিযাত্রী দলের শেরপা হিসেবে। তিনি এভারেস্ট শীর্ষে স্যার এডমন্ডের চিতাভস্ম রেখে আসবেন। নেপাল সরকার তা সযত্নে রক্ষা করবেন।

১৯৫৩ সালের ২৭ মে মানব সভ্যতার ইতিহাসের যুগান্তকারী অধ্যায় লিখে গেছেন স্যার এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে, তা কোনওদিনই ভুলবে না বিশ্ববাসী। তাদের শৌর্য্য, বীর্য, কীর্তিময় গৌরব গাথা যুগ যুগ ধরে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষকে বেঁচে থাকার ও এগিয়ে চলার চরৈবেতি মন্ত্র শিখিয়ে আসছে। সেই মন্ত্রেই বলীয়ান হয়ে নেপালী শেরপা আপা শেরপা বিশ্বের সর্বোচ্চ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে স্যার এডমন্ডের হিমালয় প্রকৃতি প্রেমের জয়ধবজা ওড়াবেন। নিউজিল্যান্ডবাসী হয়েও তিনি যে হিমালয়কে ভালোবেসে নেপাল হিমালয়ে গড়ে তোলেন একাধিক সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প।

গোলকিপার মণিভূষণ চলে গেলেন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। এরিয়ানের স্বর্ণযুগে নির্ভরযোগ্য গোলরক্ষক মণিভূষণ দত্ত রায় ৮৬ বছর বয়সে সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। স্বল্প রোগভোগের পর আর জি কর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে এরিয়ান ক্লাবের বহু স্মরণীয় ম্যাচ জয়ের পিছনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিংয়ের মতো হেভিওয়েট দলের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অসাধারণ ম্যাচ খেলে ময়দানী দর্শকদের চোখ টেনে নিয়েছিলেন। বাস্তবিকই যে সময় তিন প্রধানের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে গেছে এরিয়ান, ইষ্টার্ন রেল, বি এন আরের মতো দলগুলি। খেলার সুবাদেই মণিবাবু চাকরি পান বিখ্যাত বৃটিশ ফার্ম জার্ডিন অ্যান্ড অ্যান্ডারসনে। মাঠের মতো কর্মক্ষেত্রেও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে গেছেন দীর্ঘদিন।

মাদ্রাসার জন্য রাশি রাশি অনুদান অথচ টোল-শিক্ষার জন্য উদাসীনতা কেন?

নবকুমার ভট্টাচার্য।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য নানা উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা নিলেও, রাজ্যের টোল এবং সংস্কৃত ভাষার জন্য সরকার উদাসীন। রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে টোলগুলি আজ ধুঁকছে। আর রাশি রাশি অনুদান পেয়ে মাদ্রাসাগুলি ফুলে ফেঁপে উঠছে। এরাজ্যের চলমান শিক্ষাব্যবস্থার মূল স্রোতের সঙ্গে মাদ্রাসা ও টোল দুটি শিক্ষাব্যবস্থারই পার্থক্য রয়েছে। অথচ একটির ক্ষেত্রে সরকার সহানুভূতিশীল হলেও অপরটির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিরূপ মনোভাব নিয়েছেন। খেয়াল করলেই দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মাদ্রাসার দশম শ্রেণী অর্থাৎ 'আলিম'-এর পাঠ্যক্রমে আসমান জমিন ফারাক। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দুটো পাঠ্যক্রমকে সমতুল্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইসলামি ও আরবি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে টোলের উপাধি পরীক্ষার কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত করতে গেলে টোল উত্তীর্ণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রাহ্য হয় না। আলিমপাশ মাদ্রাসার ছাত্রদের কর্মসংস্থানের জন্য নানা সুযোগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিচ্ছেন অথচ টোলের ছাত্রদের জন্য নৈব নৈবচ। এ প্রসঙ্গে দুটি শিক্ষাব্যবস্থার সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সরকারি পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলেই চোখে পড়বে।

● মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এখন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এর সমতুল্য। অথচ টোলের জন্য বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষাদপ্তরের অধীনে হলেও তার গুরুত্ব প্রাথমিক শিক্ষাদপ্তরেরও নিচে।

● ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসা ছিল ২৩৮টি, ২০০৫-০৬ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০৮টিতে। ২০০৮-০৯ সালে তা আরও বেড়ে হয়েছে ৫৭২টি অথচ ১৯৮০ সালে সেখানে অনুদানপ্রাপ্ত টোলের সংখ্যা ছিল ৯২০। বর্তমানে অবশিষ্ট রয়েছে ৬৮৫টি। এই অবস্থা কেন?

● পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি ৩০০টি নতুন মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখনও অনুমোদনের জন্য আরও অনেক আবেদনপত্র জমা রয়েছে। এর জন্য ২১০০ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীপদ সৃষ্টি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ১০০টি নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য কাজ অবিলম্বে শুরু করতে চলেছেন অথচ টোলে বিগত কুড়ি বছর কোনও নতুন অধ্যাপক নিয়োগ দূরের কথা শূন্যপদ-গুলিতেও নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে টোল-পণ্ডিতের সংখ্যা ৮৮৫ জন। সম্প্রতি ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কমিটির সুপারিশ অনুসারে অশিক্ষক কর্মচারীর পদগুলি লুপ্ত হয়েছে। অপরদিকে মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের জন্য মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন স্থাপিত হয়েছে—দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন অ্যাক্ট ২০০৮ ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে। মাদ্রাসাগুলির জন্য মোট ৪০০০ জন ব্যক্তিকে নির্বাচনের কাজ চলছে।

গত বছরে নির্বাচক (২০০৯-১০) কমিটি মাদ্রাসার শিক্ষকপদের জন্য ১৪০০ জন প্রার্থীর নাম প্যানেল ভুক্ত করেছে।

● মাদ্রাসার শিক্ষকরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষকদের সমহারে বেতন পান অথচ টোলের পণ্ডিতদের কোনও বেতন নেই। সরকার একটা সামান্য মহার্ঘভাতা দিয়ে থাকেন। এছাড়াও সরকার খারিজি মাদ্রাসার দুইজন শিক্ষকের বেতনভার বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাদের একজন ধর্মতত্ত্ব শেখাবেন

(দৈনিক স্টেটসম্যান ২৪.৭.০৭)। বর্তমানে এরাজ্যে খারিজি উচ্চমাদ্রাসা ৮০৪টি, খারিজি প্রাথমিক মাদ্রাসা (মকতব) ২৮০০টি, খারিজি হিফন মাদ্রাসা (যেখানে শুধু কোরাণ পড়ান হয়)-র সংখ্যা ৩৫০টির মতো (দৈনিক স্টেটসম্যান ২৩.৯.০৭)।

অপরদিকে সরকারি নির্দেশে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের তৎকালীন সচিব গৌরকিশোর ভাদুড়ী কয়েকজন সংস্কৃত শিক্ষাবিদদের নিয়ে টোলের জন্য প্রস্তাবিত একটি নতুন সিলেবাস তৈরি করে টোলে টোলে বিলি করেছিলেন যেখানে পৌরোহিত্য এবং জ্যোতিষ বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছিল। সরকারি দ্বিচারিতার উদাহরণ এটি।

● মাদ্রাসার অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ, পানীয় জল, শৌচাগারসহ পরিকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। এর জন্য গত আর্থিক বছরে প্রায় ২৫ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে। ২০০৯-১০ আর্থিক বর্ষে সর্বমোট ৮৫০টি অতিরিক্ত ক্লাসঘর, ১০০টি শৌচাগার ও পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১৯.৭০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। অথচ টোলের গৃহনির্মাণ কল্পে রাজ্য সরকার কোন অর্থ সাহায্য করেন না। টোলগৃহের ভাড়া, ইলেকট্রিক বিলসহ সমস্ত খরচ-খরচা টোলের পণ্ডিতরাই বহন করে থাকেন। এজন্য রাজ্য সরকার কোনও অর্থ সাহায্য করেন না। রাজ্য সরকার ওই সামান্য মহার্ঘভাতা ছাড়া আর কিছু সাহায্য করেন না।

● মাদ্রাসায় দরিদ্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে পোষাক দেওয়া হয়। যার বার্ষিক খরচ ৩.৯১ কোটি টাকা, মাদ্রাসাগুলির গ্রন্থাগারের বই কেনার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ১১০টি বড় মাদ্রাসার জন্য ১১০টি নতুন গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আসবাব ও অন্যান্য জিনিস ক্রয়ের জন্য আরও ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অন্যদিকে টোলের জন্য এসব অনুদানের কথা ভাবার প্রয়োজন বোধ করেননি সরকার।

● পশ্চিমবঙ্গে ২০০ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে কম্পিউটার কোর্স চালু করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হচ্ছে ১২০ কোটি টাকা। অথচ টোল শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কমিটির সুপারিশে টোল ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। মনে হয় এই কমিটির সদস্যেরা ভারতবর্ষে সংস্কৃত কম্পিউটার নিয়ে যে চর্চা ও গবেষণা চলছে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। উল্লেখ্য গুজরাট সরকার রাজ্যের বৈদিক পাঠশালাগুলিতে কম্পিউটার শিক্ষা আবশ্যিক করেছেন এবং এবিষয়ে পাঠশালাগুলিকে আর্থিক সহায়তাও দিয়েছে।

● মাদ্রাসায় দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাসে ১০০ টাকা করে বৃত্তি দেবার পদ্ধতি শুরু হয়েছে। এজন্য ৫.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এছাড়াও আরও নানা বিষয়ে ৬০ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। অপর দিকে টোলের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি দেওয়া তো দূরস্থান, পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য বেসরকারি ব্যক্তি বা ট্রাস্টের দেওয়া গচ্ছিত অর্থেরই কোনও হদিস নেই।

● ২০০৯-২০১০ অর্থিক বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে বাজেটের পরিমাণ ৫৭৫ কোটি টাকা। অপরদিকে টোল শিক্ষা খাতে খরচ করা হচ্ছে মাত্র ৬ কোটি টাকা। এটিও যাতে বন্ধ করা যায় তার প্রচেষ্টা অব্যাহত।

● ১৯৭৮ সালে এরাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ উর্দু আকাদেমি স্থাপিত হয়। এই অ্যাকাদেমি National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL)-এর সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে উর্দু ভাষা প্রচার প্রসারে। ২০০৯-১০ সালের বরাদ্দ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত আকাদেমি গড়ে তোলার কোনও প্রচেষ্টা করেনি সরকার।

● উর্দু পত্র-পত্রিকাতে সরকারী সাহায্য প্রদান করা হলেও সংস্কৃত পত্র-পত্রিকাকে কোনও সহায়তা দেবার কথা ভাবা হয়নি।

● উর্দু আকাদেমির মাধ্যমে উর্দু ভাষা প্রসারের লক্ষ্যে রেজা আলি, আগা হামার কাশ্মিরী, আব্বাস আলি খান বেখুদ, নেওয়াজ আহমেদ খান নামাঙ্কিত একাধিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতরা আজও উপেক্ষিত।

● মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসন নির্মাণ হলেও টোলের ছাত্রদের জন্য এরকম কোনও ব্যবস্থা নেই। কাঁথি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবাসটি আবাসযোগ্য হয়ে উঠছে দিন দিন। সেটি সারাবার জন্য সরকার কোনও ব্যবস্থা করেনি।

● উর্দু প্রচারে স্থাপিত হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের সরকারীভাবে আরবি প্রতিশব্দ ব্যবহার হয়েছে। যেমন—

Academic Council হয়েছে Majlis-i-Talimi

Chancellor হয়েছে Amir-i-Jami

Vice-Chancellor হয়েছে Shaikh-Ul-Jamia

Registrar হয়েছে Musaij প্রমুখ। অপরদিকে সরকারি উদাসীনতা কোচবিহারের সরকারি সংস্কৃত কলেজ এবং নবদ্বীপের সংস্কৃত কলেজটি বন্ধ হয়ে গেছে। নবদ্বীপের সংস্কৃত কলেজটি প্রমোটার গ্রাস করতে উদ্যত, কোচবিহারের সংস্কৃত কলেজটি এখন সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত।

মাদ্রাসার জন্য রাশি রাশি অনুদান দেওয়া হলেও টোলশিক্ষার সামাজিক স্বীকৃতিটুকুও দিতে সরকার আগ্রহী নয়।

হিন্দুত্ব যাঁর কাছে 'ওয়ে অফ লাইফ'

(৯ পাতার পর)

● দেখ, ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতা ব্যাপারটাকে আগে ভাল করে বুঝতে হবে। ইসলামে আল্লা, খৃষ্টানে খ্রাইষ্ট, শাক্তে কালী, বৈষ্ণবে রাধাকৃষ্ণ, তিব্বতীরা গডলেস, জৈন-এ তপস্যা। এগুলো হলো রিলিজিয়ন বা ধর্ম। এবার একটু অন্যভাবে হবে যখন আমরা বলব হিন্দু ধর্ম। দেখ প্রত্যেকটা ধর্মের একজন ধর্মগুরু আছেন। তাদের নীতি আছে, শাস্ত্র আছে। কোরান, বাইবেল এসব আছে। হিন্দুধর্মের যা আছে তা হলো বেদ। কিন্তু কেউ এটা পড়ে না। আমরা যাদের ধার্মিক বলি তারা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের ধার ধারে না। আধ্যাত্মিকতা হিন্দুধর্মের সবটুকু নিয়ে, অর্থাৎ একটা 'টোটাল গড'। একটা মন। এই মনস্কতাটা হচ্ছে, পৃথিবীতে যা ঘটছে ঘটুক কিন্তু তার ওপরে কি আছে, তারও ওপরে কি আছে তার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকা। এটা কিন্তু ইংরেজদের মেটাফিজিক্সও নয়। এটা হলো, অরিজিনের দিকে যাওয়া। সৃষ্টি রহস্য হলো এক থেকে বহু। স্বামীজী বলেছেন, ৬৯টি 'এলিমেন্ট' পৃথিবী সৃষ্টি করেছে। মেন্ডেলের চার্টেও এটা ছিল। স্বামীজী বলছেন, তুমি যদি একের (১) কথা বল; তবে ওই এক-টাকে কে সৃষ্টি করল? দ্যাট মে বি অ্যান ইমপালস, দ্যাট মে বি অ্যান উইশ। এই মানসিকতাই হলো আধ্যাত্মিকতা। বেদান্তে এই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা রয়েছে। আমি ভোগ করছি কিন্তু করছি না, ঘুরছি কিন্তু ঘুরছি না। সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প, গান—এসবই কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ম্যানিফেস্ট ফর্ম। এটা মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেউ এটাকে মর্যাদা দেয়, প্রাধান্য দেয়, কেউ দেয় না। পার্থক্য শুধু এটুকুই।

❑ আপনার রচনায় ধ্রুপদী সঙ্গীতের একটা প্রভাব রয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি সেখানে সেভাবে এসেছেন?

● এখন খুব আসছেন। রবীন্দ্রনাথের গান-কে আমি মনে করি উপনিষদ। আমি রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস বা অন্যান্য রচনার চেয়েও প্রাধান্য দিই তাঁর গান-কে। সেখানে এমন অনেক কথা আছে, যার সাথে আমার ভাবনার খুব মিল। যেসব জায়গায় নিজের ভাব প্রকাশের ভাষা হারিয়ে ফেলি, সেখানেই তাঁর গানের কলির শরণাপন্ন হতে হয়।

❑ আপনি হাসির গল্পে চাপা হাসির সঙ্গে মাপা কান্না বা হাসির মধ্যে একটা প্রহসন এনেছেন। এই ভাবনাটা কেন?

● আমায় যখন গল্প লিখতে বলা হয়েছিল, কেউ কিন্তু হাসির উপন্যাস লিখতে বলেননি। কিন্তু যখন লিখতে শুরু করলাম তখন দেখলাম আমার ভেতরেই একটা ক্যারেক্টার তৈরি হয়ে গেছে। আবিষ্কার করলাম এটা আমার পরিবারের দান। তাঁরা বড় মজলিসি ছিলেন, খুব হিউমারাস ছিলেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ পছন্দ করতেন। দেখ কিছু কিছু লোক বোকার মত কিছু কাজ করে, স্রেফ 'ইগো স্যাটিসফ্যাকশনে'র জন্য। এর ফলে যে হাস্যরসের উদ্রেক হয় তার মধ্যে করুণা আছে, প্রহসনও আছে।

❑ আপনার সেই বিখ্যাত মামার বাড়ি, আর তস্যবিখ্যাত বড় মামা, মেজ মামা, বড় মাসি এঁরা সত্যিই ছিলেন? বা এঁদের সেই টাগ অব্ ওয়ারগুলো সত্যিই হোত? যাঁদের মাঝে পড়ে আপনার অবস্থাটা অনেকটা স্যান্ডুইচের মতো হয়ে যেত।

● (হাসি) হ্যাঁ। বাবা তো বলতেন, দিনকতক মামার বাড়ি থেকে এস। তাহলেই সায়েস্তা হয়ে যাবে। একবার মেজমামার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে সোদপুরে তেঘড়া বলে একটা জায়গায় কেউটে সাপ তাড়া করেছিল।

❑ লৌকিক-অলৌকিকে আপনি ছোটদাদুর কথা খুব বলেছেন। বাস্তবে সত্যিই কিনি ছিলেন?

● অবশ্যই, সে এক অসাধারণ মানুষ।

❑ গঙ্গা আপনাকে খুব আকর্ষণ করে, তাই না?

● গঙ্গা আমার জীবন। তার পাড়েই একটা খুব সুন্দর জায়গায় আমার জন্ম (বরাহনগরে)।

❑ পুরনো বাড়ির প্রতিও তো আপনার অবদমিত আকর্ষণ? আপনি খুব আফসোস করেছেন যে ছোট দাদুর সেই মার্বেলে মোড়া বাড়ি আর নেই! বাঙালীর প্রাচীন অনেক কিছুই থাকে না।

● ওরে বাবা। পুরনো বাড়ির আমি স্বপ্ন দেখি। আমার খালি মনে হয় আমার পয়সা নেই তাই, নইলে একটা পুরনো বাড়ি কিনে ফেলতাম। বেশ কুর কুর করে ভেঙে পড়ছে। পুরনো বাড়ির প্রতি আমার এত আকর্ষণ যে বাইরে যখন কোথাও যাই-টাই, তখন সবার আগে সেরকম বাড়ির সন্ধান করি।

❑ আপনি এত অসুস্থ, তার মধ্যেও আমাদের সময় দেবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

● তোমাদের স্বাগত।

Swastika
19 April - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান

হিন্দুত্বের সাধনা আর ব্যাপ্তি মিলেমিশে একাকার

বক্তব্য রাখছেন স্বামী বেদানন্দ।

উন্মোচনের পর স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যা তুলে ধরেছেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুভাই কুলকার্ণী, স্বামী বেদানন্দ ও অম্বর মুখোপাধ্যায়। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

বক্তব্য রাখছেন মধুভাই কুলকার্ণী।

বক্তব্য রাখছেন অম্বর মুখোপাধ্যায়

বক্তব্য রাখছেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেশব ভবনের সুবিস্তৃত হলঘরে সুরের একটা যাদুকরী ধাক্কা—'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে।' পতপত করে উড়ছে গেরুয়া রঙা ধ্বজ। তার ব্যাপ্তি ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে হতে আকাশ ছুঁয়ে ফেলছে। কেশব ভবনের শ'দুয়েক শ্রোতা উৎসুক নেত্রে অভ্রভেদী রথের সন্ধানে পরিব্যাপ্ত। তাদের কৌতূহল বাড়িয়ে মঞ্চে দৃশ্যমান 'তত্ত্বমসি' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ, নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার কলকাতা ব্যুরো চীফ্ অম্বর মুখোপাধ্যায়, আর এস এসের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্য মধুভাই কুলকার্ণী এবং 'স্বস্তিকা' পত্রিকার প্রকাশক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বস্তিকা'র সম্পাদক বিজয় আঢ্যকেও দেখা গেল। থালার ওপর চমৎকার কারুকার্যকরা কাগজে মোড়া একটি বস্তু নিয়ে এগিয়ে চলেছেন মধুভাই-এর দিকে। ওই আপাদমস্তক মোড়া 'গিফট প্যাকে'-এর নিচে যে স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যা উঁকি মারছে, আমন্ত্রণ পত্রের দৌলতে তা সবারই মোটামুটি জানা ছিল। কিন্তু তারই মধ্যে যে অভ্রভেদী রথের সন্ধান রয়েছে কেই বা বুঝবেন তখন! অতঃপর মধুভাই কর্তৃক সেই নববর্ষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন। যার বিষয় হিন্দুত্ব। ঘড়ির কাঁটা তখন ছ'-এর ঘর ছুঁয়েছে। দিনান্তের রবি অস্তাচলে গেছেন। ১১ই এপ্রিলের কেশবভবনীয় রবি-সান্ধ্যবাসর জমজমাট।

অভ্রভেদী রথের সুলুক-সন্ধানে নেমে পড়লেন মধুভাই। রামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি, সাধনাভূমি, কর্মভূমি এককথায় লীলাভূমি এই বঙ্গদেশে এসে হিন্দুত্ব নিয়ে বলার একটা অন্যরকম মানে খুঁজে পেয়েছেন তিনি। তাঁর এহেন সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গীতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে স্বয়ং 'স্বস্তিকা' নামটিই। হিন্দুর পরিচিত দৃশ্যপটে স্বস্তিকা অমূলক নয়। গৈরিক ধ্বজের মতোই শাশ্বত। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মধুভাই-এর দৃষ্টিভঙ্গিতেও সেই সনাতন বাণীরই প্রতিধ্বনি—হিন্দুত্বই ভারতীয়ত্ব, রাষ্ট্রীয়ত্ব। রাষ্ট্রভাবনার সঙ্গে এভাবেই মিলে গেল হিন্দুত্ব। আর এই দুই ভাবনার সাযুজ্যে কোথাও একটা বড় ধরনের ছাপ রেখে গেল স্বস্তিকার ১৪১৭ সনের নববর্ষ সংখ্যাটি। এই বিষয়টাকে আরও প্রস্ফুটিত করলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী বেদানন্দ মহারাজ। তাঁর বিগত তিন বছর ধরে স্বস্তিকা-কে 'দেখা'র অভিজ্ঞতা বলছে, স্বস্তিকা সবাইকে সম্মান করে, ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে কিন্তু কেউ ভুল করলে সেই ভুলটাকে আঙুল তুলে দেখাতেও দ্বিধা করে না।

তাঁর ৩১ বছরের সাংবাদিক জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে স্বস্তিকার জন্য নিংড়ে দিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অম্বর মুখোপাধ্যায়। অম্বরবাবুর 'সাজেশন'—স্থানীয় খবর সংগ্রহে জোর দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য এলাকাভিত্তিক খবর করাটা অত্যন্ত জরুরী বলে অম্বরবাবুর মনে হয়েছে। তাঁকে বিস্মিত করেছে এই খবরটা যে, দীর্ঘ ছ'দশকেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞাপনের ভরসায় না থেকে স্বমহিমায় স্বস্তিকার প্রকাশনার কাজ চলে এসেছে। কিন্তু বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে বিশেষ করে দূরদর্শনের প্রভাবে যখন খবর পড়ার আগ্রহ বেশ কমেছে তখন তাঁর মনে হচ্ছে যে ফিচার-ধর্মী খবর খবরের আকর্ষণ বাড়ায়। সংবাদপত্র যে দরিদ্রের তথ্যভান্ডার (পুওরম্যানস্ ডিকশনারি) সেদিকে লক্ষ্য রেখেই স্বস্তিকাকে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন তিনি।

নববর্ষ সংখ্যার বিষয়বস্তুর (থিম) দিকেই তাঁর ফোকাসটাকে রেখেছিলেন মধুভাই কুলকার্ণী। তিনি বলছেন, হিন্দুত্ব মানে সত্যের নিরন্তর সাধনা। আর স্বস্তিকাও বছরভর ধরে সেই সত্যেরই সাধনা করে চলেছে। হিন্দুত্বের সাধনা আর ব্যাপ্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে দিয়েছেন স্বাভিমান বজায় রাখা বিশ্বায়নের তত্ত্ব যা অভূতপূর্ব তো বটেই, অচিন্ত্যনীয়ও। যেমন—আব্রাহাম লিঙ্কন হতে পারেন মহাপুরুষ কিন্তু সেটা আমেরিকানদের কাছে, ভারতীয়দের কাছে নয়। একইভাবে শিবাজী মহারাজ ভারতীয়দের কাছে যতটা প্রণম্য কিন্তু আমেরিকানদের কাছে ততটা নন।

স্বামী বেদানন্দ মহারাজ বলছেন ধর্ম সম্বন্ধে এদেশের মানুষের অজ্ঞতাটাই সবচেয়ে বড় কাল হয়েছে। অনন্ত দুঃখের সাগরে স্বস্তিকার তরণী ভাসিয়ে মহারাজের মার্গদর্শন—'প্রথমে সমাজ উদাসীন থাকবেই, তারপর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবে কিন্তু শেষে সে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।"

লেখক থেকে সাধারণ পাঠক সবাইকেই তাঁর আন্তরিক স্বাগত ভাষণে আপন করে নেন প্রকাশক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সহ-সম্পাদক নবকুমার ভট্টাচার্যের রাবীন্দ্রিক ধাঁচের পরিচালনা অন্য মাত্রা যোগ করে অনুষ্ঠানটিতে। সর্বোপরি সংস্কার ভারতী'র গোটা তিনেক রবীন্দ্র- নিবেদন রবিবাসরীয় সন্ধ্যাকে নিয়ে যায় এক অন্যধরনের উচ্চতায়। ধন্যবাদজ্ঞাপনে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ব্যবস্থাপক অভিজিৎ রায়চৌধুরী বোঝালেন, বড় কিছু করতে গেলে মাথাটা নীচু করতেই হয়। স্বস্তিকা পরিবারের বিনম্র নিবেদনে কেশব ভবনে তখন অজস্র আলোক-বর্তিকা। তিনি বাহির পথে বেরোচ্ছেন। তিনি ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা মানে হিন্দুত্ব।

অনুষ্ঠানে সমবেত মানুষের একাংশ। ছবি ঃ বাসুদেব পাল

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com